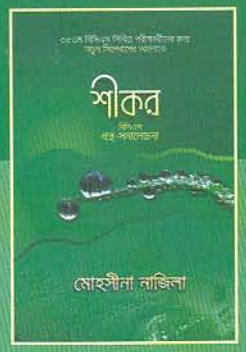

মেঘ প্রকাশনা
বাড়ি-৪৯, রোড-১০, দক্ষিণ বিশাইল,
চাইনিজ বাসষ্ট্যান্ড, মিরপুর-১, ঢাকা

design centre : 01732966753, 01767838935

৩৫তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার্থীদের জন্য
নতুন সিলেবাসের আলোকে

শীকর

বিসিএস
গ্রন্থ-সমালোচনা

মোহসীনা নাজিলা

সূচিপত্র

উপন্যাস

আলালের ঘরের দুলাল / ৮
হুতোম প্যাঁচার নকশা / ১০
দুর্গেশ নন্দিনী / ১২
কপালকুন্ডলা / ১৪
বিষবৃক্ষ / ১৬
রূপজালাল / ১৮
কৃষ্ণকান্তের উইল / ২০
বিষাদ সিন্ধু / ২২
চোখের বালি / ২৪
সুলতানার স্বপ্ন / ২৬
গোরা / ২৮
আনোয়ারা / ৩০
পল্লী সমাজ / ৩২
শ্রীকান্ত / ৩৩
গৃহদাহ / ৩৫
পদ্মরাগ / ৩৭
বাঁধন হারা / ৩৯
শেষের কবিতা / ৪১
পথের পাঁচালী / ৪৩
মৃত্যুক্ষুধা / ৪৬
কুহেলিকা / ৪৮
আবদুল্লাহ / ৪৯
পদ্মা নদীর মাঝি / ৫১
পুতুল নাচের ইতিকথা / ৫৩
আরণ্যক / ৫৫
কবি / ৫৭
নদী ও নারী / ৫৯
হাঁসুলী বাকের উপকথা / ৬০
লালসালু / ৬২
কাঁশবনের কন্যা / ৬৪
সূর্য দীঘল বাড়ি / ৬৫
তিতাস একটি নদীর নাম / ৬৭
তেইশ নম্বর তৈলচিত্র / ৬৯
উত্তম পুরুষ / ৭১
ক্রীতদাসের হাসি / ৭৩
হাজার বছর ধরে / ৭৫
শংসপ্তক / ৭৭
কাঁদো নদী কাঁদো / ৮০
পাপের সন্তান / ৮১
নন্দিত নরকে / ৮২
আমার যত গ্লানি / ৮৪
রাইফেল রোটি আওরাত / ৮৬
ওঙ্কার / ৮৮
হাঙ্গর নদী গ্রেনেড / ৯০
নিষিদ্ধ লোবান / ৯২
প্রদোষে প্রাকৃতজন / ৯৪
পদ্মার পলিদ্বীপ / ৯৬
চিলে কোঠার সেপাই / ৯৮
খোয়াবনামা / ১০০
মা / ১০২
আগুন পাখি / ১০৪

কাব্যগ্রন্থ

মেঘনাদবদ কাব্য / ১০৮
সোনার তরী / ১১০
মহাশ্মশান / ১১২
গীতাঞ্জলি / ১১৫
অগ্নিবীণা / ১১৭
নকশী কাঁথার মাঠ / ১১৯
বনলতা সেন / ১২১
সাত সাগরের মাঝি / ১২২
রূপসী বাংলা / ১২৪
সোনালী কাবিন / ১২৬
আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি / ১২৮

নাটক

নীলদর্পন / ১৩১
একেই কি বলে সভ্যতা / ১৩৪
কৃষ্ণকুমারী / ১৩৬
সধবার একাদশী / ১৩৮
জমিদার দর্পন / ১৪০
ডাকঘর / ১৪২
রক্তকরবী / ১৪৪
নবান্ন / ১৪৬
নেমেসিস / ১৪৮
কবর /১৫০
রক্তাক্ত প্রান্তর /১৫২
সুবচন নির্বাসনে /১৫৪
পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় /১৫৬
ওরা কদম আলী /১৫৭
কিত্তনখোলা /১৫৮

উপন্যাস

আলালের ঘরের দুলাল

লেখকের নাম : প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)
প্রথম প্রকাশ : ১৮৫৮
সংস্করণ : এপ্রিল ২০০৯
প্রকাশক : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন
পৃষ্ঠা : ১৫১
মূল্য : ২৩০ টাকা

উনিশ শতকের শুরুতে বাংলা ভাষার গদ্যরূপ প্রকাশিত হয়। আরও পরে বাংলা কথাসাহিত্য তথা উপন্যাস শিল্পের বিকাশ। রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগরসহ খ্যাতিমান লেখকদের সংস্কৃত এবং ইংরেজীঘেঁষা উচ্চমার্গের সাধু ভঙ্গিতে লেখা গ্রন্থ যখন সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝা অসম্ভব ছিল। প্যারীচাঁদ মিত্র তখন লেখ্য ও কথ্যরীতির মিলন ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা অবলম্বনে সর্বজনবোধগম্য নবতর এক গদ্যরীতির সূচনা করেন। আর এ রীতি অবলম্বন করে বাংলা উপন্যাসের প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩) 'আলালের ঘরের দুলাল'(১৮৫৮)। সংস্কৃত এবং ইংরেজ লেখকদের অনুসরন না করে সেকালের কলকাতার অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষাকে সাহিত্যের বাহন হিসেবে গ্রহণ করে নিজস্ব চিন্তা-চেতনার আলোকে বিষয়বস্তু নির্বাচনের মাধ্যমে রচনা করেন 'আলালের ঘরের দুলাল'।

'আলালের ঘরের দুলাল' প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রথম গ্রন্থ । ১৮৫৪ সাল থেকে এটি মাসিক প্রত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে। সাহিত্য সমালোচকগণের মতে; এটি বাংলা সাহিত্যের শেষ্ঠ সামাজিক নকশা। গ্রন্থটি সম্পূর্ণ সামাজিক পটভূমিকায় রচিত। নব্যশিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গলদের কার্যকলাপ ও পরিণতি এ গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এখানে দেশীয় বন্ধ্যা শিক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ নিয়ে লেখকের অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার আলোকে উচ্চ আদর্শ সম্পন্ন জীবন গঠনকে লেখক স্বাগত জানিয়েছেন। প্যারীচাঁদ মিত্র এই নবলব্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করেছেন যে ধর্ম ও নীতিহীনতাই উচ্ছৃঙ্খলতার মূল কারণ। সুতরাং ধর্মীয় ও নৈতিক

জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যেই রয়েছে এ থেকে মুক্তির পথ। এ কথা প্রমাণ করার জন্যই তিনি লিখেছেন আলালের ঘরের দুলাল।

আলালের ঘরের দুলালের কাহিনী এরূপ- ধনী বিষয়ী বাবুরামের অতি আদরের পুত্র মতিলাল আবাল্য কখনও ধর্মীয় ও নীতির শিক্ষা পায় নি। শিক্ষার ব্যাপারেও পিতা ছিলেন উদাসীন। উপরন্তু কুসঙ্গ তাকে অধঃপতনের শেষ ধাপে নিয়ে যায়। পিতার মৃত্যুর পর প্রাপ্ত সব সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলে। পরে দুঃখের জীবনে তার বোধদয় ঘটে এবং হৃদয়-মন পরিবর্তিত হয়। অন্যদিকে মতিলালের অনুজ রামলাল আদর্শ চরিত্র। বরদাবাবুর একান্ত স্নেহছায়ায় বড় হয়ে তার সকল নির্দেশ মান্য করে সে সর্বজনের প্রশংসা অর্জন করেছে। মতিলালের চৈতন্যোদয় এবং আদর্শ জীবনের প্রতি আকর্ষণের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে উপন্যাসের। গ্রন্থের এই দুই প্রধান ঘটনাস্রোত বিচিত্র খন্ড ক্ষুদ্র ঘটনায় পল্লবিত হয়েছে। মূল ঘটনা অপেক্ষা এ বিচিত্র ক্ষুদ্র পল্লবিত ঘটনাই গ্রন্থটির আশ্চর্য সফলতার কারণ। বস্তুতঃ বরদাবাবুর মত মূর্তিমান নীতিপাঠ, বেনী বাবুর মত সজ্জন অথবা আদর্শ যুবক রামলাল এরা কেউই আলালের মত মূল আকর্ষণীয় নয়। এদের মধ্যে সুশিক্ষা থাকতে পারে কিন্তু উপন্যাসের যা প্রধানতম উপকরণ জীবনের স্বাদ তা এই চরিত্রগুলোতে নেই। আলালের অবিস্মরণীয় সাফল্য এনে দিয়েছে মতিলাল স্বয়ং এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ হলধর, গদাধর ইত্যাদি। এছাড়াও ধূর্ত উকিল বটলর, ধরিবাজ মুৎসদ্দি বাঞ্ছারাম, তোষামোদকারী বক্রেশ্বর বাবু ইত্যাদি চরিত্র জীবন্ত। তবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলো মোকাজান মিঞা বা ঠকচাচা। চরিত্রটি ধূর্ততা, বৈষয়িক বুদ্ধি ও প্রাণময়তা নিয়ে এ গ্রন্থের সবচেয়ে জীবন্ত চরিত্র।

আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সমাজের খন্ডচিত্রগুলো সুনিপুনভাবে অঙ্কিত হয়েছে। যা সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ গ্রন্থে তিনি প্রথমবারের মত বাংলা সাহিত্যের গদ্যরীতির নিয়ম ভেংগে সচেতনভাবে সংস্কৃতের পরিবর্তে চলতি ভাষা প্রয়োগ করেছেন। যা সাধারণ মানুষের ভাষা। এ উদ্যোগটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ গদ্যরীতি বাংলা সাহিত্যে 'আলালী রীতি' হিসেবে পরিচিত। আর এর মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শিল্পনৈপূন্য প্রদর্শনপূর্বক তিনি হয়ে উঠলেন প্রথম সার্থক গদ্যশিল্পী এবং স্বকীয় সত্ত্বায় ভাস্বর। আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাস হিসেবে স্বার্থক না হতে পারে কিন্তু এ গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা গদ্য সাহিত্যে এক নতুন পথ সূচিত হয়েছে এবং আধুনিক উপন্যাস রচনার পথ সুগম করে দিয়েছে।

আলালী ভাষারীতি বাংলা গদ্যের মাধ্যম হিসেবে টিকতে পারেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে যে আদর্শ গদ্যরীতির উদ্ভব ঘটেছিল তার পিছনে এ আলালী রীতির অবদান অনস্বীকার্য। আর এখানেই প্যারীচাঁদ মিত্রের সার্থকতা।

প্যারীচাঁদ মিত্র 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে এ উপন্যাসটি পত্রিকায় লেখেন। আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাস কিনা এ নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলেন এটি বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস। আবার কারো মতে এটি উপন্যাস নয়, উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। আলালের ঘরের দুলাল সার্থক উপন্যাস না হলেও বাংলা ভাষায় উপন্যাস রচনার প্লাটফর্মটি তৈরি করে দেয়। এ গ্রন্থটি 'দি স্পয়েড চাইল্ড' নামে ইংরেজীতেও অনূদিত হয়েছে।

হুতোম প্যাঁচার নকশা

লেখকের নাম : কালী প্রসন্ন সিংহ
প্রথম প্রকাশ : ১৮৬২
সংস্করণ : ১ম, ১৪এপ্রিল ২০০৯
প্রকাশক : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন
পৃষ্ঠা : ১৪৯
মূল্য : ২৩০ টাকা

উনিশ শতকের শুরুতে বাংলা গদ্য প্রকাশিত হয়ে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে। বাংলা উপন্যাসের প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) এরপর উল্লেখযোগ্য কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২)। বাচনভঙ্গি, রচনারীতি, আঙ্গিক প্রভৃতি দিক থেকে লেখক এ গ্রন্থে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালী ভাষার ক্রিয়াপদে সাধু ও কথ্যরীতির মিশ্র প্রয়োগরীতি বর্জন করে ভাষাকে আরও স্নিগ্ধ ও শ্রুতিমধুর করেন এবং গ্রন্থে কলকাতার কথ্য ভাষাকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোম প্যাঁচার নকশা অত্যন্ত বেদনার সাথে কলকাতার সামাজিক ক্ষতচিহ্নের যথার্থ ছবি ব্যঙ্গাকারে ফুটিয়ে তুলেছেন। মূলত এটি

উপন্যাস নয়, সামাজিক সমস্যামূলক ব্যক্তিগত রচনা। তারপরও হুতোম প্যাঁচার নকশা উপন্যাসের মতোই সুখপাঠ্য। এর মাধ্যমে কলকাতা ও তার পাশ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষের কথ্য ভাষাকে প্রথম সাহিত্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। হুতোম প্যাঁচার নকশায় কলকাতায় হঠাৎ ফেঁপে ওঠা ঐশ্বর্য ভারাক্রান্ত নব্যসমাজ এবং তার প্রায় সব ধরণের মানুষের চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এ গ্রন্থে যাদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে তারা প্রায় সবাই লেখকের স্বশ্রেণীর ও তৎকালীন সমাজের অসাধারণ পরিচিত মানুষজন। তারা তিন ভাগে বিভক্ত- সাহেবি ওল্ড অর্থ্যাৎ ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত সাহেবী চালচলনের অন্ধ অনুকরণকারী। ইংরেজী শিক্ষিত নব্যপন্থী যারা অন্ধ অনুকরণকারী নয় এবং ইংরেজী না জানা গোঁড়া হিন্দু। এরা সকলেই কমবেশি জাল-জুয়াচুরি, ফন্দি ফিকির করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। অনেক অনেক বাস্তব চরিত্রকে হুতোম অঙ্কন করেছিলেন ছদ্মবেশে। সেই সঙ্গে পাতায় পাতায় সেকালের শহরের নানা প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান, যানবাহন ও পল্লীর চিত্রময় বর্ণনা দিয়েছেন। যে বর্ণনায় ছবির মতো ফুটিয়ে তুলেছে নাগরিক জীবনের ব্যস্ততা।

সমকালের বাস্তব জীবন যেমন, তেমনি জীবনসংলগ্ন ভাষাভঙ্গির জন্য গ্রন্থখানি ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মৌখিক ভাষার প্রথম সুষ্ঠু প্রয়োগ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলা গদ্যে এরকম নিরঙ্কুশ কথ্যরীতির যর্থাথ প্রয়োগ ইতোপূর্বে দেখা যায় নি। লেখক হুতোম ছদ্মনামে লিখতেন বলে এর ভাষা 'হুতোমী বাংলা' বলে পরিচিত। এর ভাষা প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালী ভাষা থেকে মার্জিততর ও বিশুদ্ধতর। এতে কথ্য ও সাধু ক্রিয়াপদের মিশ্রণ নেই।

'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় উপন্যাসের কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়লেও, শিল্প বিচারে একে যথার্থ উপন্যাস বলা চলে না। এতে কোন ধারাবাহিক কাহিনী নেই, কোন চরিত্র চিত্রণের সচেতন প্রয়াস নেই। সে আমলের কলকাতার কতগুলো সামাজিক চিত্রের ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনাই এতে স্থান পেয়েছে। মূলত লেখক এটিকে উপন্যাসের আদলে লেখার আদৌ কোন চেষ্টা করেন নি।

উনিশ শতকের কলকাতার বাঙালী সমাজকে জানার অন্যতম প্রধান উপায় হল হুতোমের নকশা। নকশায় ব্যক্তিগত আক্রমণ থাকলেও শ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করে নি। গ্রন্থে উল্লিখিত যে সকল চরিত্র নিন্দা করার মত নয় লেখক তাদের সঙ সাজিয়ে উপস্থাপন করেছেন। লেখকের সরস উপস্থাপন ঐ সময়ের সমাজের নানা অসঙ্গতিকে পাঠকের সামনে জীবন্ত করে তোলে।

দুর্গেশনন্দিনী

লেখকের নাম : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রথম প্রকাশ : ১৮৬৫
সংস্করণ : বইমেলা ২০১৫
প্রকাশক : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন
পৃষ্ঠা : ১৪৪
মূল্য : ১৫০ টাকা

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ব্রিটিশ ভারতীয় শিক্ষিত ও সচেতন বাঙ্গালীদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) ছিলেন অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর নবজাগরণে ভূমিকা রাখেন লেখনী ধারণ করে। তার লেখনীতে বিকশিত হয় বাংলা সাহিত্য ধারা। উনিশ শতকের গোড়াতে বাংলা গদ্যের প্রকাশ হলেও কথাসাহিত্য তথা উপন্যাস শিল্পের সার্থক সূচনা হয় তার হাতে। তিনিই প্রথম পাশ্চাত্যরীতি অবলম্বন করে 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) রচনা করে সার্থক বাংলা উপন্যাস ধারার সূচনা করেন। সূচনার পাশাপাশি এ ধারাকে বিকশিত করেন একের পর এক সার্থক উপন্যাস রচনার মাধ্যমে এবং বাংলা উপন্যাসের জনক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৬২ সালে ছাব্বিশ বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস রচনায় হাত দেন। ১৮৬৩ সালে খুলনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালনকালে এ উপন্যাস রচনা শেষ করেন এবং এটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে।

দুর্গেশনন্দিনীর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক উপন্যাসের সূত্রপাত। দুর্গেশনন্দিনী ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস হলেও এটিকে সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক উপন্যাস মনে করা হয় না। উপন্যাসের পটভূমিতে রয়েছে- ষোল শতকের শেষ পর্যায়ে উড়িষ্যার অধিকার নিয়ে মোঘল ও পাঠানদের মধ্যকার সংগ্রামের ঘটনা। উপন্যাসের কাহিনী এরূপ- দিল্লীশ্বরের সেনাপতি মানসিংহের পুত্র কুমার জগৎসিংহ মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানদের উপর চোরাগোপ্তা হামলা চালাচ্ছিল। এক পর্যায়ে বিষ্ণুপুর থেকে মান্দারণ যাত্রাকালে ঝড়ের কবলে পড়ে শৈলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে আশ্রয় নেন। সেখানে ঘটনাচক্রে মান্দারণ দুর্গাধিপতি জয়ধর সিংহের পুত্র মহারাজ বীরেন্দ্র সিংহের স্ত্রী বিমলা ও তার কন্যা দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমার সাথে সাক্ষাত হয়। জগৎসিংহ ও তিলোত্তমা নিজেদের প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখলেও দুজন

দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। পরে পাঠান সেনাপতি ওসমান খাঁ সুকৌশলে মান্দারণ দূর্গ দখল করে বীরেন্দ্র সিংহ, স্ত্রী বিমলা ও কন্যা তিলোত্তমাকে বন্দী করে। পাঠান নবাব প্রহসনের বিচারের নামে কতলূ খার মাধ্যমে বীরেন্দ্র সিংহকে হত্যা করে। এদিকে বিমলা কতলূ খাঁকে হত্যা করে স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নেয়। পাঠানেরা কুমার জগৎসিংহের মাধ্যমে অম্বররাজ মানসিংহ তথা দিল্লীশ্বরের সঙ্গে সন্ধি করে। অন্যদিকে কতলূ খাঁর নবাবজাদী আয়েশা জগৎসিংহের প্রেমে পড়ে। আয়েশার প্রণয়ী পাঠান সেনাপতি ওসমান একথা জানার পর ক্রোধে কুমার জগৎসিংহের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। পরিশেষে মান্দারণ পুনরায় স্বাধীন হয় ও দিল্লীশ্বরের প্রধান সেনাপতি অম্বররাজ মানসিংহের মাধ্যমে মহারানী বিমলার হস্তে রাজ্যপাঠ হস্তান্তর করে এবং মহাধুমধামের সাথে কুমারজগৎ সিংহ এবং দুর্গেশনন্দিনীর তিলোত্তমার মিলন ঘটে।

ঐতিহাসিক বিপ্লব একজন দুর্গস্বামীর ভাগ্যের উপর কিরুপ প্রভাব পড়ে তাই চিত্রিত হয়েছে এ উপন্যাসে। দূর্গ জয়ের বিবরণে বীরেন্দ্র সিংহের বিচারের দৃশ্য ও কতলু খানের হত্যার বর্ণনায় শিল্পীর উচ্চ মার্গের পরিচয় পাওয়া যায়। কারাগারে আয়েশার প্রেমাভিব্যক্তির দৃশ্যটাই উপন্যাসের কেন্দ্রস্থল। উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্রের মধ্যে রয়েছে- বীরেন্দ্র সিংহ, ওসমান, তিলোত্তমা, আয়েশা, বিমলা প্রমূখ।

উপন্যাসে যুদ্ধবিগ্রহের কলকোলাহলের স্থান দেওয়া হলেও এতে প্রেমের সূচনা, বিকাশ, পরিণতির পরিচয় দান করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়ে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্র বহুগুণে বাড়িয়ে দিলেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এক নতুন অধ্যায় খুলে দিয়েছে।

কপালকুন্ডলা

লেখকের নাম	: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ধরন	: রোমান্সধর্মী
প্রথম প্রকাশ	: ১৮৬৬
সংস্করণ	: ৪র্থ, ২০১৫
প্রকাশক	: বিশ্ব সাহিত্য ভবন
পৃষ্ঠা	: ১৪৩
মূল্য	: ১৮০ টাকা

উনিশ শতকের গোড়াতে বাংলা গদ্যে সাহিত্য তথা উপন্যাস শিল্পের সার্থক সূচনা হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হাতে। একাধিক স্বার্থক উপন্যাস রচনা করে তিনি এ ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তার রচিত বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় স্বার্থক উপন্যাস কপালকুন্ডলা (১৮৬৬)। এ উপন্যাসের নিগুঢ় ভাবসঙ্গতির জন্য একে রোমান্সধর্মী উপন্যাস বলা যায়। অরণ্যে কাপালিক পালিতা নারী কপালকুন্ডলাকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে। সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে অপরিচিতা এই নারীর নবকুমারের সাথে বিয়ে এবং তার সমাজ বন্ধনের সাথে দ্বন্দ্বই এর মূল কাহিনী। কপালকুন্ডলার মধ্যে যে রহস্য, সে রহস্য উদঘাটনই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। উপন্যাস শুরু হয় এভাবে- তীর্থ যাত্রীদের নৌকা পথ হারিয়ে এক মোহনায় উপস্থিত হয়। জনবিচ্ছিন্ন সে জায়গায় নৌকার সবার জন্য আহারের ব্যবস্থা করতে নবকুমার বনের মধ্যে কাঠ আনতে যায়। কিন্তু এরই মধ্যে জোয়ার আসলে নবকুমারকে রেখেই সবাই চলে যায়। সে বনে নবকুমারের দেখা হয় এক কাপালিকের সাথে। কাপালিক তাকে ভৈরবীর কাছে বলি দিতে চায়। কিন্তু কাপালিকের আশ্রিতা কন্যা কপালকুন্ডলার সহয়তায় নবকুমার পালিয়ে যায়। পরে নবকুমার কপালকুন্ডলাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয় ও তারা বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার জন্য যাত্রা শুরু করে।

এখানে শুরু হয় কাহিনীর নতুন ধারা। নবকুমারের আগের এক স্ত্রী ছিল যে ঘটনাচক্রে ধর্মান্তরিত হয়ে আগ্রায় চলে যায়। মতি ছদ্মনাম ধারণ করে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু সে নবকুমারকে মন থেকে সরাতে পারে না। পথিমধ্যে সরাইখানায় কপালকুন্ডলার সাথে দেখা হলে জানতে পারে নবকুমারের সাথে কপালকুন্ডলার বিয়ের কথা। এরপর থেকে সে চেষ্টা করে কপালকুন্ডলা ও নবকুমারের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে। এদিকে কাপালিকও আসে কপালকুন্ডলাকে নিয়ে বলি দিতে। মতি কাপালিকের সাথে হাত মিলায় এবং কাপালিকের হাতে

তুলে দেওয়ার জন্য কপালকুন্ডলাকে কৌশলে ঘর থেকে বের করে আনে। একপর্যায়ে নবকুমার সব বুঝতে পারে। উপন্যাসের শেষে দেখানো হয় স্রোতময় নদীর তীর থেকে কপালকুন্ডলা হারিয়ে যায়, আর তাকে খুঁজতে নবকুমার নদীতে নামে। তাদের কেউ আর ফিরে আসে না- এখানেই উপন্যাস শেষ হয়। এভাবে এর কাহিনী সবরকম বাহুল্য বর্জন করে বিষাদময় পরিণতির দিকে এগিয়ে গিয়েছে।

উপন্যসের কাহিনীর একদিকে আছে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়কার আগ্রার নগর ও স্থাপত্য এবং অন্যদিকে আছে অরণ্য ও সমুদ্র। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইতিহাসের একটি চরিত্রকে কল্পিত কাহিনীর সমান্তরালে স্থাপন করে নির্ভেজাল রোমান্স সৃষ্টি করেছেন। উপন্যাসে শিল্পী রোমান্স ব্যবহার করেছেন কিন্তু তা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করেননি। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কপালকুন্ডলা, নবকুমার ও কাপালিক ইত্যাদি।

প্রকৃতির সৌন্দর্য ও রহস্যময়তা, কপালকুন্ডলার চরিত্র, কাহিনীর ট্রাজিক পরিণতি-এ সব মিলিয়ে 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসটি বঙ্কিমের উল্লেখযোগ্য রচনা। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই উপন্যাসের একটি নাট্যরূপ দেন এবং দামোদর মুখোপাধ্যায় এই উপন্যাসের উপসংহার উপন্যাস রচনা করেন মৃন্ময়ী শিরোনামে।

কপালকুন্ডলা উপন্যাসের সাথে স্মৃতিবিজড়িত একটি ঐতিহাসিক বকুল ফুলের গাছ খুলনা জেলা প্রশাসকের বাসভবন এলাকায় দাঁড়িয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন খুলনা জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সরকারি কাজ শেষে এ গাছের নিচে বসে বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুন্ডলা উপন্যাসের বেশ কয়েকটি অধ্যায় রচনা করেন। কিছুদিন আগে কালবৈশাখি ঝড়ে গাছটি ভেঙ্গে যায়।

বিষবৃক্ষ

লেখকের নাম : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রথম প্রকাশ : ১৮৭৩
সংস্করণ : বইমেলা ২০১৩
প্রকাশক : তিশা বুক ট্রেড
পৃষ্ঠা : ১১০
মূল্য : ১৪০ টাকা

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ব্রিটিশ ভারতীয় শিক্ষিত ও সচেতন বাঙ্গালীদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) ছিলেন অন্যতম। সার্থক বাংলা উপন্যাসের রূপকার বঙ্কিমচন্দ্রের লেখালেখির মূলমন্ত্র ছিল সমাজ সচেতনতা। বঙ্কিমচন্দ্রের চতুর্থ উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' সামাজিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসটি ১৮৭২ সালে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বারটি কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ সালের ১ জুন। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের বিষয়বস্তু সমসাময়িক বাঙালি হিন্দু সমাজের দুটি প্রধান সমস্যা- বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথা।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের পটভূমি বিধবাবিবাহ আইন পাশ হওয়ার সমসাময়িক কাল। এই উপন্যাসের নায়িকা বিধবা কুন্দনন্দিনীর চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যার ছায়া অবলম্বনে রচিত হয় বলে জানা যায়। উপন্যাসের কাহিনী এরূপ- গোবিন্দপুরের জমিদার নগেন্দ্রনাথ দত্ত কলকাতা যাত্রার পথে অনাথা বালিকা কুন্দনন্দিনীর সাথে দেখা হয়। কুন্দর অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধার করে কলকাতায় নগেন্দ্রের ভগিনী কমলমনির কাছে রেখে আসেন। কিন্তু পরে স্ত্রী সূর্যমুখীর একান্ত অনুরোধে তার গোবিন্দপুরে নিয়ে আসেন। সূর্যমুখীর দুরসম্পর্কীয় ভাই তারাচরণের সঙ্গে কুন্দের বিয়ে হয়। কিন্তু বিবাহের কিছুকাল পরেই তারাচরণের মৃত্যু হলে কুন্দ বিধবা হয়। এরপর কুন্দের রূপলাবন্য দেখে নগেন্দ্রনাথ নিজেই তার আকৃষ্ট হয়। কুন্দও নগেন্দ্রের প্রতি অনুরক্তা হয়ে পড়েন। সূর্যমুখী বিষয়টি অনুধাবন করেন। অন্যদিকে দেবীপুরের দুশ্চরিত্র জমিদার দেবেন্দ্রও তারাচরণের গৃহে কুন্দকে দেখে তার রূপে আকৃষ্ট হয়। হরিদাসী বৈষ্ণবীর বেশ ধরে নগেন্দ্রর বাড়িতে এসে কুন্দকে কুপ্রস্তাব দিয়ে যান। এদিকে সূর্যমুখী কমলমনিকে চিঠিতে নগেন্দ্রনাথের কুন্দের প্রতি আকৃষ্টতা জানালে কমলমনি কুন্দকে কলকাতা নিয়ে আসতে চায়। কুন্দ আত্মহত্যা করতে চেয়েও ব্যর্থ হয়। হরিদাসী বৈষ্ণবীর ঘটনায় সুর্যমুখী কর্তৃক অপমানিতা

হয়ে কুন্দ গৃহত্যাগ করে। তার অদর্শনে নগেন্দ্র অস্থির হয়ে পড়ে এবং সূর্যমুখীর প্রতি রুষ্ট হন। তিনি গৃহত্যাগের সংকল্প করেন। এমতাবস্তায় কুন্দ ফিরে এলে সূর্যমুখী নিজ উদ্যোগে স্বামীর সঙ্গে তার বিয়ে দেন। তারপর নিজে গৃহত্যাগ করেন। তাকে খোঁজার জন্য নগেন্দ্র লোক পাঠায় কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় না। এদিকে সূর্যমুখী ঘুরতে ঘুরতে রোগাক্রান্ত হয়। শেষে এক ব্রহ্মচারীর শুশ্রুষায় সুস্থ হয়ে উঠেন। ব্রহ্মচারীই নগেন্দ্রনাথকে সংবাদ পাঠান। পরে উভয়ের পূর্নমিলন ঘটে। এরপর তারা গৃহে ফিরে আসে। অপরদিকে নগেন্দ্রনাথ গৃহে ফিরে কুন্দর সঙ্গে দেখা না করায় কুন্দ বিষপান করে। পরদিন সকালে সূর্যমুখী যখন কুন্দকে দেখতে আসেন, তখন তার অন্তিম সময় আসন্ন। শেষে নগেন্দ্রনাথের পায়ে মাথা রেখে কুন্দ ইহলোক ত্যাগ করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম তিনটি উপন্যাস রোমান্সধর্মী এবং সেখানে সৌন্দর্যসৃষ্টিই তার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এ উপন্যাসে শুধু সৌন্দর্যসৃষ্টিই নয়, সেই সঙ্গে দেশ ও মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধনের ইচ্ছাও যে তাঁর ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই বিষবৃক্ষ উপন্যাসের শেষ ছত্রে তার মন্তব্য- 'আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।' অর্থাৎ এ ধরণের প্রণয়াকাঙ্খা রহিত হবে। বঙ্কিম কি চেয়েছেন সেটি মূখ্য বিষয় নয়। তিনি বিষবৃক্ষের মাধ্যমে তিনি সমাজের বহুবিবাহের কুফল অত্যন্ত সুন্দরভাবে চিত্রায়ণ করতে পেরেছেন। পাশাপশি একটু ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারি-বাল্যবিধবা কুন্দনন্দিনীর প্রেম ও কামনাকে তৎকালীন সমাজ স্বীকৃতি দেয়নি এ উপন্যাসই তার প্রমাণ। বিষবৃক্ষ আজো বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসসূমহের মধ্যে অন্যতম।

রূপজালাল

লেখকের নাম : নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী
প্রথম প্রকাশ : ১৮৭৬
সংস্করণ : ২০০২
প্রকাশক : বাংলা একাডেমী
পৃষ্ঠা : ৩১৭
মূল্য : ১০০ টাকা

উনবিংশ শতাব্দীর এক বিস্ময়কর প্রতিভা, নারী জাগরন ও নারী শিক্ষার অন্যতম অগ্রদূত নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী (১৮৫৫-১৯০৩)। তাঁর রচিত 'রূপজালাল' গদ্য ও পদ্য ছন্দে রচিত আত্মজীবনী ও কল্পকাহিনীমূলক একটি গ্রন্থ। এটি বাংলার একজন মুসলিম মহিলা কর্তৃক প্রথম রচিত একটি পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম। রূপজালালের ভূমিকায় ফয়জুন্নেসা উল্লেখ করেছেন তাঁর নিজের বৈবাহিক জীবনের দু:খ লাঘব করার আকাঙ্খা থেকে গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

নওয়াব ফয়জুন্নেসা নিজের জীবন কাহিনী রাজপূত্র জালালের রূপবানু এবং হুরবানুর সঙ্গে বিবাহবিষয়ক আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজপূত্র জালাল প্রথম স্ত্রী রূপবান বিদ্যমান থাকা অবস্থায় হুরবানুকে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। হুরবানু নির্দ্বিধায় তাঁর স্বামী জালালের প্রথম স্ত্রী রূপবানুকে মেনে নিয়েছে। এদিকে রাজপূত্র জালাল রূপবানু ও হুরবানুর প্রতি সমান দৃষ্টি দিয়েছেন এবং দুই স্ত্রীকে স্বতন্ত্র জায়গায় রেখে সুখে রেখেছেন। ফয়জুন্নেসার দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না, কিন্তু রূপজালালে তিনি জালাল ও তাঁর দুই স্ত্রীর বিবাহিত জীবনের একটি সুখকর ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

নওয়াব ফয়জুন্নেসার জীবন কাহিনী এরূপ- কিশোরী নওয়াব ফয়জুন্নেসার বিয়ের প্রস্তাব আসে ভাউকসার জমিদার মোহাম্মদ গাজী চৌধুরীর পক্ষ থেকে। গাজী চৌধুরী ফয়জুন্নেসার দুসম্পর্কিত ফুফাত ভাই। ফয়জুন্নেসা নাবালিকা বিধায় বিবাহের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এতে গাজী চৌধুরী ভাবাবেগে সংসারের প্রতি অনাসক্ত হয়ে উদাসীনভাবে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। অনেক চেষ্টা করে তাকে বিয়ে দেওয়া হয় ত্রিপুরার বিচারপতি সরাইলের নজমুন্নেসার সাথে। কিন্তু মোহাম্মদ গাজী চৌধুরীর মনে ছিল ফয়জুন্নেসা তাই প্রথম স্ত্রী নাজমুন্নেসার সাথে সম্পর্ক ভাল হয় নি। ফয়জুন্নেসার পিতা মারা যাবার পর গাজী চৌধুরী আবার বিয়ের প্রস্তাব দিতে থাকেন। অনেকটা বাধ্য হয়ে ফয়জুন্নেসার মা বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হন। তবে শর্ত ছিল- ফয়জুন্নেসা সতীনের সঙ্গে একত্রে বাস

করতে স্বামীর বাড়িতে যাবেন না। বাপের বাড়িতেই থাকবেন। তাদের দাম্পত্য জীবন কয়েক বছর বেশ সুখেই কাটে। এর মধ্যে আরশাদুন্নেসা ও বদরুন্নেসা দুই কন্যা জন্ম হয়। কিন্তু গাজী চৌধুরী যখন বিবাহের চুক্তি লঙ্ঘন করে ফয়জুন্নেসাকে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে একই বাড়িতে জীবন যাপনে বাধ্য করেন। তখন তাদের সংসার জীবন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কঠোর শপথের মধ্য দিয়ে দুইজন আলাদা হয়ে যান। বিবাহ বিচ্ছেদ না হলেও এরপর যতদিন বেঁচে ছিলেন কেউ কারো মুখ দেখেন নি। ফয়জুন্নেসা এর প্রতিশোধ হিসেবে তিনি স্বামীর নীতিবিরুদ্ধ বহুবিবাহের সমালোচনা করেন। দ্বিতীয় স্ত্রী হয়ে থাকার চেয়ে একাকী থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন।

পিতা আহমদ আলী চৌধুরী মারা যাবার পর তাঁর মাতা আফরান্নেছা বেশিদিন জমিদারী চালাতে পারেন নি। এক সময় তিনি নিজেই জামিদারির হাল ধরেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই প্রজাদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। তৎকালীন সময়ে কুমিল্লার জেলা প্রশাসক মি. ডগলাস জেলার সংস্কার কাজের পরিকল্পনা করে অর্থাভাবে পড়েন। তিনি অর্থশালী বিত্তবান হিন্দু জমিদারদের কাছে অর্থ ঋণ চেয়ে ব্যর্থ হন। মুসলমানরা ব্রিটিশদের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিল তাই মি. ডগলাস কোন মুলসমান জমিদারের কাছে অর্থ ঋণ পাওয়ার কথা ভাবেন নি। অনন্যোপায় হয়ে মুসলিম নারী জমিদার ফয়জুন্নেসার কাছে ঋণ চান। ফয়জুন্নেসা মি. ডগলাসকে প্রয়োজনীয় অর্থসহ একটি ঠিটি পাঠান। এই ঠিটিতে লেখা ছিল- আমি জনকল্যাণমূলক যেসব কাজ করতে চেয়েছিলাম তা আপনার হাত দিয়ে হোক এই আশা করি।... ফয়জুন্নেসা যে টাকা দিয়েছে তা দান হিসেবে দিয়েছে, কর্জ হিসেবে নয়।' তার এ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্রিটিশ রানী ভিক্টোরিয়া ১৮৮৯ সালে তাঁকে 'নওয়াব' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ফয়জুন্নেসা 'রূপজালাল' গ্রন্থটিতে নিজের জীবন কাহিনী লিখলেও শেষটা নিজের মনের মত করে লিখেছেন। স্বামীকে যেমন চেয়েছিলেন উক্ত রচনার নায়ককে তেমন পৌরুষদীপ্ত বীররূপে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া এ গ্রন্থকে মুসলিম সমাজ নিয়ে পাশ্চত্যে রচিত সাহিত্যের একটি প্রতিবাদ হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। তৎকালীন পাশ্চত্যের সাহিত্যকর্মে মসুলিম পুরুষদের পৌরুষত্বহীন, ভীতু ও কাপুরুষ হিসেবে উপস্থাপন করা হতো। আর মুসলিম নারীদের চিত্রায়িত করা হতো পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টান বীরদের লালায়িত রমণী হিসেবে। এর প্রতিবাদস্বরুপ এ গ্রন্থটিতে ফয়জুন্নেসা মুসলিম নারীদের স্বপ্ন পুরুষরুপে পৌরুষদীপ্ত একজন সাহসী মুসলিম পুরুষের বর্ণনা দিয়েছেন। অন্যদিকে সিপাহী বিদ্রোহত্তোরকালে ব্রিটিশ ভারতের মুসলিম সমাজ নানাভাবে

অধিকার বঞ্চিত হয়। এ গ্রন্থে একজন বীরপুরুষ চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে ফয়জুন্নেসা তাঁর সময়ের মুসলিম সমাজকে হতাশা ও নৈরাশ্য থেকে মুক্ত করে আশা ও প্রেরণা জোগাতে প্রয়াসী হন।

নওয়াব ফয়জুন্নেসা এ গ্রন্থে নারীর অধিকারচেতনা ও বহুবিবাহর সমালোচনার পাশাপাশি নারীর আত্মমর্যাদার বিষয়টিও তুলে ধরেছেন। রূপজালাল গ্রন্থটি নারীর প্রতি সমাজের প্রচলিত ধারণার একটি অসাধারণ প্রতিবাদ স্বরূপ।

কৃষ্ণকান্তের উইল

লেখকের নাম : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রথম প্রকাশ : ১৮৭৮
সংস্করণ :১ম, ২০১০
প্রকাশক : ইউপিএল
পৃষ্ঠা : ৯৫
মূল্য : ১২৫ টাকা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) উল্লেখযোগ্য সামাজিক উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮)। উপন্যাসে রোহিনী, গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের ত্রিভূজ প্রেমের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। স্ত্রীর বর্তমানে বিধবা নারীর প্রতি পুরুষের প্রেমাসক্তির কুফল এ উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য।

এ উপন্যাসের অন্যতম আলোচিত তথা বাংলা সাহিত্যের এক অমর চরিত্র 'রোহিনী'। বাল্যবিধবা রোহিনী রূপবতী, বুদ্ধিমতী ও চঞ্চলা। অন্যদের থেকে রূপে গুণে বেশি হয়েও সে বিধবা হওয়ায় সংসার সুখ থেকে বঞ্চিত। প্রথমেই সে সম্পত্তির উইল চুরি করে কৃষ্ণকান্তের সাথে প্রতারণা করে হরলালকে বিয়ে করার জন্য কিন্তু হরলালও রোহিনীর সাথে প্রতারণা করে। এই বলে যে- 'আমি যাই হই--- কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র, সে (রোহিনী) চুরি করিয়াছে তাহাকে কখনো গৃহিনী করিতে পারিব না।' তারপর সে প্রেমে পড়ে কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভাতুষ্পুত্র, ভ্রমরের স্বামী গোবিন্দলালের। বাল্যবিধবা রোহিনীর অসাধারণ রূপ ও সব কাজের পটুতা স্ত্রীর ভালবাসায় পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও গোবিন্দলালকে আকর্ষণ করে। সে করুণাবশত রোহিনীকে চুরির অপরাধে কৃষ্ণকান্তের শাস্তি থেকে বাঁচাতে চায়। আর তখনই রোহিনী গোবিন্দলালকে ভাললাগার কথা বলে ফেলে। গোবিন্দলাল তাকে না করে দেয়। গোবিন্দলালকে না পাওয়ার বেদনা

ও ব্যর্থ যৌবনের হাহাকারে সে বার বার আত্মহত্যার চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে গোবিন্দলাল রোহিনীর প্রেমে সাড়া দেয়।

উপন্যাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র গোবিন্দলালের স্ত্রী ভ্রমর । সারা উপন্যাসব্যাপী তার বিস্তার। স্ত্রী হিসেবে অত্যন্ত সহজ সরল গৃহবধু। যার কাছে স্বামীই সব। তার মতে স্বামীকে অবিশ্বাস করতে নেই, সব ক্ষেত্রেই স্বামীকে অনুসরণ করা স্ত্রীলোকের ধর্ম। গোবিন্দলাল রোহিনীর প্রেমে পড়ে বিনা দোষে এই ভ্রমরের সাথে প্রতারণা করে। একপর্যায়ে স্ত্রীকে রেখে রোহিনীকে নিয়ে গোবিন্দলাল পালিয়ে যায় এবং তারা যশোরে একসাথে বসবাস করতে থাকে। তবে গোবিন্দলাল রোহিনীকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয় না, কিন্তু তার কাছ থেকে শর্তহীন পতিব্রত্য দাবি করেছিল। রোহিনীর সাথে বসবাসের সময় একপর্যায়ে সে ভ্রমরকে ফিরে পেতে চায়। যেভাবে ভ্রমরের সাথে বসবাস করার সময় এ রোহিনীকে কামনা করেছিল। মোটকথা গোবিন্দলাল যা চেয়েছে তার মূল্য দিতে কখনোই প্রস্তুত থাকে নি।

অন্যদিকে ভ্রমরের পিতা নিজের কন্যার সংসার ও জীবন বাঁচানোর জন্য রোহিনী ও গোবিন্দলালকে আলাদা করার কৌশল অবলম্বন করে। সে চক্রান্ত করে নিশাকরের মাধ্যমে একটি ফাঁদ পাতে। রোহিনী নিজের রূপের আকর্ষণ যাঁচাইয়ের মোহে সে ফাঁদে পা দেয়। নিশাকরের সাথে চুপসারে দেখা করতে এসে গোবিন্দলালের নিকট হাতেনাতে ধরা পরে। গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে তার মৃত্যু হয়। তখন গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে কিন্তু ততদিনে অপেক্ষায় জর্জরিত ও অসুস্থ ভ্রমরের জীবনাবসান ঘটেছে। গোবিন্দলাল সন্ন্যাস গ্রহণ করে। এ উপন্যাসের কাহিনীতে এটুকু ফুটে উঠে যে এরকম পরিস্থিতিতে পুর্নমিলনের সম্ভাবনা থাকে না। প্রেমের উপাখ্যান সবসময় মিলনে শেষ হয় না, ট্রাজেডিতেও শেষ হয়।

এ উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণে, ঘটনা বিন্যাসে ও চরিত্র চিত্রণে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে রোহিনী চরিত্র চিত্রণে। উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক পাঠককে পরনারীতে আসক্তির কুফলের শিক্ষা দিতে চেয়েছেন তাকে ছাপিয়ে রোহিনী চরিত্রের বেদনা-বঞ্চনা ও বিনাশই (হত্যা) পাঠককে ভাবিয়ে তোলে। রোহিনী চরিত্র শুধু এ উপন্যাসেই নয় সমগ্র বাংলাসাহিত্যে একটি ঈর্ষণীয় চরিত্র। বঙ্কিম নিজেও এ উপন্যাসে রোহিনীকে কেন্দ্র করে নৈতিক আদর্শ ও শিল্পবোধের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে যান। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্মিত 'বিনোদিনী'কে (চোখের বালি) রোহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র মনে করা হয়। সব মিলিয়ে কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ রচনা।

বিষাদ সিন্ধু

লেখকের নাম : মীর মশাররফ হোসেন
প্রথম প্রকাশ : ১ম পর্ব ১৮৮৫,
২য় পর্ব ১৮৮৭, ৩য় পর্ব ১৮৯১
সংস্করণ : বইমেলা ২০১১
প্রকাশক : বিশ্বসাহিত্য ভবন
পৃষ্ঠা : ৩৪৭
মূল্য : ৩০০ টাকা

বাংলা সাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেন বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম বাঙ্গালী লেখকদের মধ্যে অগ্রজ। সমকালীন বাঙালী লেখকদের মধ্যে তিনি নি:সন্দেহে শ্রেষ্ঠ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। উপন্যাস, কাব্য, নাটক এবং নানারকম গদ্যরচনা অর্থাৎ কথাসাহিত্যের প্রায় সব শাখায়ই ছিল তার মুখর পদচারণা। তার বিখ্যাত রচনা বিষাদ-সিন্ধু (১৮৮৫)। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে সব গ্রন্থ জনপ্রিয়তায় শতাব্দীর সীমা অতিক্রম করেছে, বিষাদ-সিন্ধু তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

বিষাদ-সিন্ধু মূলত একটি ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস। হিজরী ৬১ সালের মহররম মাসে নবী নন্দিনী হযরত ফাতেমা (রা.)-র ছেলে হোসাইনের সঙ্গে উমাইয়া খলিফা মুয়াবিরার একমাত্র পূত্র এজিদের কারবালার প্রান্তরে রক্তক্ষয়ী এবং ইমাম হাসানের স্বপরিবারে শাহাদাতের কাহিনীই 'বিষাদ সিন্ধু'র মুল আলোচ্য বিষয়। এতে একই সাথে মানবজীবনের দু:খ-যন্ত্রণা, হিংসা বিদ্বেষ ইত্যাদি যেমন চিত্রিত হয়েছে, তেমনি ইতিহাসের পটভূমিকায় সিংহাসন নিয়ে দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম, রক্তপাত, হত্যাকান্ড ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসটি মহররম পর্ব, উদ্ধার পর্ব ও এজিদবধ পর্ব- এই তিন পর্বের। উপসংহারসহ সর্বমোট তেষট্টিটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

বিষাদ-সিন্ধুর সুচনা হয়েছে- হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর এক ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে এবং ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থের উপসংহার ঘটে। বিষাদ-সিন্ধুর অধিকাংশ ঘটনাই জয়নবকে কেন্দ্র করে। হোসেন ও এজিদের সংঘর্ষের মূল কারণ জয়নাব। জয়নব সতীসাধ্বী স্ত্রী। প্রথম স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে দ্বিতীয়বার পরিণীতা হন ইমাম হোসেনের সঙ্গে। কিন্তু কিশোর বয়স থেকে জয়নবের প্রেমে মরিয়া এজিদ। প্রণয়ে ব্যর্থতা এজিদের অন্তরে যে ক্রোধানল জ্বেলেছে তার ফলে, কারবালা প্রান্তরে সে হয়ে উঠেছে নির্মম,

পৈশাচিক, দানবীয়। ভাগ্যের পরিহাসে কারবালার ঘটনার পর জয়নব বন্দী হন এজিদের কারাগারে। কারাগারে বন্দী থেকে তার মনে হতে থাকে সে নিজেই কারবালার ঘটনার জন্য দায়ী। এজিদকে স্বামীত্বে বরণ করে নিলেই তো আর এসব ঘটনা ঘটত না। মুয়াবিয়া পুত্র এজিদের প্রণয়াসক্তির ব্যর্থতা ও পরিণতির এই কাহিনী নিয়ে প্রথম পর্ব (মহররম)। দ্বিতীয় খণ্ডে (উদ্ধার পর্ব) আছে বিপন্ন হোসেন পরিবারের অস্তিত্বরক্ষা ও দুর্জয় বীর হানিফার প্রতিশোধ গ্রহণের বিবরণ এবং তৃতীয় খণ্ডে (এজিদ বধ পর্ব) আছে হানিফার এজিদ হত্যার প্রচেষ্টা, দৈব নির্দেশে বহু প্রাণক্ষয়কারী হানিফার প্রাকৃতিক বন্দিত্ব এবং হোসেন বংশধর জয়নালের রাজ্যলাভের কাহিনীর বর্ণনা।

ইতিহাসের সত্যকে মহাকাব্যিক বিশালতায় রূপ দান করার মধ্যে লেখকের শিল্পচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাসের সত্যকে অত্যন্ত সফলভাবে শিল্পের সত্যে রূপান্তরের কারণেই তিনি অর্জন করেছেন কালোত্তীর্ণ সিদ্ধি। লেখক মূল ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা রক্ষা করেছেন কিন্তু ইতিহাসের অন্ধ অনুকরণ করেননি। হাসান হোসেনের সঙ্গে এজিদের বিরোধ রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বপ্রসূত এ কথা ঐতিহাসিক সত্য। মীর মশাররফ হোসেনের রচনায় এই সংঘাতের মূল কারণ এজিদের অনিবার্য রূপতৃষ্ণা। সেই রূপতৃষ্ণার উদভ্রান্তকারী শক্তিকে গ্রন্থকার সামাজিক মনের দ্বারা চালিত হয়ে নিন্দা করেন নি। শিল্পীমন দিয়ে সবিস্ময়ে অবলোকন করেছেন। তাইতো লেখকের দৃষ্টিতে এজিদ খলনায়কের পরিবর্তে ব্যর্থ নায়ক হয়ে উঠেছে।

এ উপন্যাসে কখনো লেখক সংযমহীন অনিয়ন্ত্রিত আবেগতাড়িত হয়ে কিছু অলৌকিক ঘটনার অসঙ্গত বর্ণনা দিয়েছেন। এমনকিছু ঘটনার উল্লেখ আছে যেগুলো ইতিহাসের আলোকে বিচার করা চলে না। আবার বাস্তব জীবনেও সে গুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা চলে। এছাড়াও কিছু অতিপ্রাকৃত ঘটনার উল্লেখ আছে। যেমন- এযিদের চোখের সামনে থেকে হোসেনের খন্ডিত শির অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, কারবালার প্রান্তরের গাছ থেকে রক্তক্ষরণ, হোসেনের দাফনের সময় তার পিতামাতার মর্তে আগমন ইত্যাদি।

বিষাদ সিন্ধুর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মানবজীবনের এই অদৃষ্টলাঞ্ছিত রূপের আলেখ্য। মানবভাগ্যের এ আবেগময় রূপায়নের জন্য বিষাদ সিন্ধু মূল্যবান। রচনারীতির পারিপাট্য, কাহিনীর নাটকীয়তা, ঘটনার চমৎকারিত্ব ও চরিত্রচিত্রণের দক্ষতা প্রথম পর্বে যেমন দেদীপ্যমান, পরবর্তী দু-খন্ডে তেমন নয়। তবে এর ভাষা আগাগোড়াই পুষ্পিত, গতিময় ধ্বনিতরঙ্গবিশিষ্ট। ভাষা এই রচনার বিশিষ্ট সম্পদ।

বিষাদ-সিন্ধু ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত স্পর্শকাতর কাহিনী হওয়ায় সাধারণ মুসলিম পাঠকদের কাছে জনপ্রিয় হয়। পাশাপাশি এর রচনাগুণের জন্য সাহিত্যিক মর্যাদাও লাভ করে । প্রথমে পাঠ্যপুস্তক হিসেবেই জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরে এই জনপ্রিয়তার সূত্রধরে জারিগানের আসরে প্রশ্নোত্তর পর্বে আত্তীকৃত হয়। আধুনিক বাংলা ভাষার গদ্যরীতিতে রচিত মীর মশাররফ হোসেনের লিখিত সাহিত্য বিষাদ-সিন্ধু পুরোটাই বাংলাদেশে নেত্রকোনা অঞ্চলে প্রচলিত জারিগানের আদলে আত্তীকৃত হয়েছে।

চোখের বালি

লেখকের নাম : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রথম প্রকাশ : ১৯০৩
সংস্করণ : ২০১০
প্রকাশক : জ্ঞানের আলো
পৃষ্ঠা : ১২৮
মূল্য : ১৪০ টাকা

বাংলার উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসীয় জীবনবোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের চেতনা এবং মানুষের আত্মানুসন্ধানের গভীর বিন্যাস রবীন্দ্র-উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। সময় ও সমাজ বিধৃত মানব-মনস্তত্ত্বের অন্তস্থল সন্ধানী উপন্যাস 'চোখের বালি' (১৯০৩)। বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিকাশমান ধারায় এবং রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে উপন্যাসটির অবস্থান স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। ঔপনিবেশিক বাংলাদেশের অনুজ্জ্বল মধ্যবিত্তের অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, তাদের মানসদ্বন্দ্ব ও মূল্যবোধের অসঙ্গতি সম্পর্কে রবীন্দ্রচেতনার প্রথম শব্দরূপ চোখের বালি। প্রথমে এটি বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সমাজ ও যুগযুগান্তরাগত সংস্কারের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের বিরোধ এ উপন্যাসের মূল আলোচ্য বিষয়। উপন্যাসের কাহিনী সংসারের সর্বময়কর্ত্রী মা, এক অনভিজ্ঞা বালিকাবধূ, এক বাল্যবিধবা ও তার প্রতি আকৃষ্ট দুই পুরুষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

চোখের বালি উপন্যাসের নায়িকা বিনোদিনী বিয়ের অল্প দিনের মধ্যেই বিধবা হয়। মিশনারি মেমের কাছে সে পড়াশোনা করছিল। বিনোদিনী বুদ্ধিমতি,

শরীরে খরযৌবনের প্রখর দীপ্তি। ঘটনাচক্রে মহেন্দ্রর মা রাজলক্ষ্মী নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন বিনোদিনীকে। মহেন্দ্র বিনোদিনীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। এই আশ্রিতা বিনোদিনীই ধীরে ধীরে ব্যাপক ও দুর্নিবার হয়ে উঠে। তার আকর্ষণে মহেন্দ্রর সাধের দাম্পত্য জীবন ছারখার হয়ে যায় ।

বিনোদিনীতে বিমোহিত মহেন্দ্র পরকীয়ার মধ্যে অনুভব করেছিল আপন সংস্কৃতি সচেতন চেতনার প্রতিচ্ছবি। আশার মধ্য দিয়ে প্রাত্যহিকতার পরিতৃপ্তি হলেও নবজাগরিত শিক্ষিত চেতনার পরিতৃপ্তির জন্য সমচেতনা সম্পন্ন মানবী বিনোদিনীর প্রয়োজন হয়েছিল মহেন্দ্রের মত আলোকপ্রাপ্ত পুরুষের। সমাজতান্ত্রিক সমাজে মহেন্দ্র জীবনকে এতদিন শুধু পুরুষের আধিপত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত দেখেছিল। তার মা রাজলক্ষী কাকীমা অন্নপূর্ণা এবং আশার কাছ থেকে যে স্নেহ ভালবাসা পেয়েছিল তা সে জন্মগত প্রাপ্য মনে করেছিল। স্নেহপ্রীতি পেতে গেলে যে নিজেকেও দিতে হয় কোন দিন তা উপলব্ধি করে নি। বিনোদিনী তার জীবনে প্রথম নারী যে তাকে দেখালো অপরের কাছ থেকে গুরুত্ব পেতে হলে তার নারী পুরুষ নির্বিশেষে নিজগুণে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। বিনোদিনীকে দেখে মহেন্দ্র প্রথম সমচেতনা সম্পন্ন স্ত্রীর অভাব উপলব্ধি করেছিল। যদিও বিহারীর সাথে বিয়ে হওয়ার কথা থাকলেও মহেন্দ্রের পছন্দ হওয়ায় সে আশালতাকে বিয়ে করে। মহেন্দ্র ক্রমে বুঝতে পেরেছে জীবনসঙ্গী শুধু শয্যা সঙ্গী নয়, জীবনের পথ পরিক্রমণে আত্মিক সঙ্গীর প্রয়োজন। বিনোদিনীর সঙ্গে পরিচয়ের পর সে অনুভব করেছে যে আশার মধ্যে যে মাধুর্য আছে তা দিয়ে কল্পনার জগত সাজানো যেতে পারে কিন্তু জীনব পথ পরিক্রমায় প্রয়োজন সহ পদক্ষেপের। বিনোদিনীই মহেন্দ্রকে বুঝিয়েছে নারীকে জোর করে নয় জয় করে পেতে হয়।

উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য আরেকটি চরিত্র বিহারী। বিহারী মহেন্দ্রর তুলনায় অনেকটা স্থির স্বভাবের। উপন্যাসের শুরুতেই মহেন্দ্রের অসঙ্গত ইচ্ছার কাছে বিসর্জন দেয় আশালতাকে। আবার যেকোন সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে রাজলক্ষ্মী-মহেন্দ্র-অন্নপূর্ণার মধ্যে মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেছে। তবে তার চরিত্রের নেতিবাচক দিক হচ্ছে রূঢ় নির্বিকারতা। ফলে আশালতার প্রতি লালন করতে হয়েছে গোপন প্রণয় এবং একপর্যায়ে বিনোদিনীকে গ্রহণ করতে চাইলেও শেষপর্যন্ত কোন কার্যকরী প্রণয়াবেগে সে জেগে উঠতে পারেনি। এছাড়া উপন্যাসের দ্বন্দ্বাত্মক গতিসঞ্চারের জন্য রাজলক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণা চরিত্রও গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের মনোজগৎ ক্রমাগত ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে নানা বাঁকে। ঘটনা পরম্পরা নয় হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতই সবকিছুর

নিয়ামক। বাংলা উপন্যাসে এমন মানস চরিত্রের বয়ন আর কখনো দেখা যায় নি। 'চোখের বালি' সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারার সৃষ্টি করেছিল বাংলা কথাসাহিত্যে।

প্রচলিত বিন্যাসরীতি অনুসারে এ উপন্যাসের ঘটনাংশ আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত। ৫৫টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এ উপন্যাসে মহেন্দ্র-আশা-বিনোদিনী-বিহারীর মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা থাকলেও এতে বর্ণিত সমস্যা-সংকট, জটিলতা ও পরিণাম বিনোদিনী কেন্দ্রিক।

এ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সান্নিধ্যে মানব মনের যে পরিবর্তন হয় তা প্রকাশ করতে গিয়ে প্রকৃতিকে সত্তাময় ও ব্যক্তিত্বময় করে উপস্থাপন করেছেন। ঔপন্যাসিক সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে সরল তথ্যধর্মী বর্ণনায় উপস্থাপন করেছেন। তবে চরিত্রের সংলাপ-প্রতিসংলাপে কাহিনী অগ্রসর হয়েছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশিত এ উপন্যাসটি কাহিনী বিন্যাস, চরিত্রায়ন ও সর্বোপরি অন্তর্বয়ন কৌশলে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের ধারায় সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

সুলতানার স্বপ্ন

লেখকের নাম : বেগম রোকেয়া
প্রথম প্রকাশ : ১৯০৮
সংস্করণ : ২০০৫
প্রকাশক : ন্যাশনাল পাবলিকেশন
পৃষ্ঠা : ১১০
মূল্য : ১০০

মুসলিম নারীমুক্তির পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) মুসলিম সমাজের কুসংস্কার ও জড়তা দূর করে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠাকল্পে লেখালেখি শুরু করেন। বেগম রোকেয়ার একটি বিস্ময়কর লেখা ও পাঠক নন্দিত গ্রন্থ 'সুলতানাস ড্রিম বা সুলতানার স্বপ্ন'। সে এক কল্পলোকের কাহিনী। কাহিনীটি যিনি বলেছেন তার নাম সুলতানা। তার ধারণা তিনি জেগেই ছিলেন। কিন্তু আসলে তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। দেখেন তিনি এক আশ্চর্য জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নাম নারীস্থান। এখানে কোন মারামারি হানাহানি নেই, কোন অশান্তি নেই। কারণ সব পুরুষ এখানে শৃঙ্খলাবদ্ধ। ভগিনী সারা নামে যে

মহিলাটি সুলতানাকে সঙ্গ দিচ্ছে সে বলছে, স্বয়ং শয়তান এখানে শৃংখলাবদ্ধ, পুরুষরা অন্তঃপুরে। জননিরাপত্তার স্বার্থে পুরুষদের রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হয় না। তাই মেয়েরা এখানে অধিক নিরাপদ। একবার নারীস্থান রাজ্যে পাশ্ববর্তী রাজ্যের কয়েকজন বিদ্রোহীকে আশ্রয় দেওয়াকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ বেঁধে যায়। রাজ্যের পুরুষ সৈন্যরা দলে দলে আহত-নিহত হয়। এক পর্যায়ে পুরুষ প্রায় নিঃশেষ, রাজ্য প্রায় বিপন্ন। সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। আহার নিদ্রা প্রায় বন্ধ। এমনই এক সময় এগিয়ে আসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান (মহিলা)। তার বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্র নেই, সবাই ছাত্রী। পুরুষদের সবাইকে অন্তপুরে প্রবেশ করিয়ে দুই হাজার স্বেচ্ছাসেবিকা নিয়ে রওনা দিলেন যুদ্ধে। তারা সীমান্ত পর্যন্ত যাননি, শত্রুপক্ষের সাথে হাতাহাতিও করেন নি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগৃহীত সূর্যের কিরণ দুর থেকে নিক্ষেপ করে শত্রু শিবিরে। সূর্যের তাপ সহ্য করতে না পেরে শত্রুরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়।

সেই কল্পরাজ্যে দুটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সৃষ্টিশীল গবেষণাকেন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আবিস্কার করেছে মেঘ থেকে পানি সংগ্রহের পদ্ধতি। যার ফলে মানুষকে আর আকাশের দিকের তাকিয়ে থাকতে হয় না। আরেকটি আবিস্কার করেছে সৌর শক্তি সংগ্রহের পদ্ধতি। ঐই রাজ্যে এরোপ্লেন চলে, কৃষিকার্যে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য যে রোকেয়া যখন এই লেখা লেখেন তখন ভারতবর্ষে এরোপ্লেন এসে থাকলেও রোকেয়া তা দেখেন নি।

এ গ্রন্থে বেগম রোকেয়া একটি নারীর স্বপ্ন রাজ্য বা ইউটোপিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন, যেখানে সমাজে নারী ও পুরুষদের প্রচলিত ভূমিকা উল্টে গেছে। নারীরা সমাজের যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রধান চালিকাশক্তি আর পুরুষরা প্রায় গৃহবন্দী। এই সমাজের কোন অপরাধ নেই, এখানে প্রচলিত ধর্ম ভালবাসা ও সত্যের।

সময়ের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর ছিলেন নারী শিক্ষার অগ্রদূত মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া। তার সুলতানার স্বপ্ন নিতান্তই কল্পনা। এতে তিনি লিখেছিলেন এক কল্পিত নারীস্থানের কথা। যে দেশে নারী ও পুরুষের ভূমিকা উল্টে দেওয়া হয়েছে। দেশ শাসন থেকে শুরু করে সবকিছু করে নারীরা। আর পুরুষেরা করে ঘরের কাজ। পুরুষরা যন্ত্রপাতি পরিচালনা করে, খাতাপত্র হিসেব রাখে, শিশুদের দেখাশুনা করে এবং রান্নাবান্না করে।

এ গ্রন্থের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল এখানে লেখিকা রান্নাবান্না থেকে শুরু করে যুদ্ধ করার কাজেও সৌরশক্তি ব্যবহারের কথা বলেছেন। পাশাপশি বিমান পথে যাতায়াত, বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদ এবং সৌরচুল্লিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রান্নবান্নার কথা বলেছেন। যা রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন'কে বৈজ্ঞানিক ইউটোপিয়ায় পরিণত করেছে। সেই ইউটোপিয়ায় বিজ্ঞানচর্চা আছে, পল্লীবাসীও উচ্চ শিক্ষিত, বাল্যবিবাহ প্রথা নেই। আছে মেয়েদের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়। সবচাইতে বড় বিষয় হচ্ছে - রোকেয়ার বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক চিন্তার বহি:প্রকাশে বর্ণিত এ নারীস্থানে তিনি তিনি কোন আদিম স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করেন নি। সৃষ্টি করেছেন ভবিষ্যতের বিজ্ঞান নির্ভর সমাজ। কেননা বিজ্ঞানই শুধু মুক্তি দিতে পারে নারীকে। সুলতানার স্বপ্ন রোকেয়ার নারীতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় ও পুরুষতন্ত্রের চূড়ান্ত পরাজয়ের কাহিনী। যেখানে পুরুষতন্ত্রের দুর্বলতাকে চোখে আঙ্গুল দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। চিহ্নিত করা হয়েছে নারীর শক্তির জায়গাগুলো।

বেগম রোকেয়া যে সময়ে এই বইটি লিখেছেন সেই সময়ের ধর্মীয় ও সামাজিক বাস্তবতায় এটিকে অত্যন্ত সাহসী সাহিত্যকর্ম হিসেবে গণ্য করা হয়।

গোরা

লেখকের নাম	: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রথম প্রকাশ	: ১৯১০
সংস্করণ	: নভেম্বর, ২০১৪
প্রকাশক	: রূপান্তর প্রকাশনী
পৃষ্ঠা	: ৫৫৫
মূল্য	: ২৫০ টাকা

বাংলার উনিশ শতকীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের চেতনা এবং মানুষের আত্মানুসন্ধানের গভীর বিন্যাস রবীন্দ্র-উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন, হিন্দু সংস্কার আন্দোলন, দেশপ্রেম এবং নারীমুক্তি ও সামাজিক অধিকার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত। গোড়া হিন্দুত্ববাদী এক যুবকের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি মনেপ্রাণে উপলব্ধি করা, ধর্মের ও জাতপাতের গোঁড়ামির অসারত্ব বুঝতে পারা, এই

নিয়েই রবীন্দ্রনাথের এ উপন্যাস গোরা। এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৃহত্তম উপন্যাস । প্রবাসী পত্রিকায় ১৯০৮-১০ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে ছাপা হয়। ১৯১০ সালে প্রকাশিত এ উপন্যাসকে বলা হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একমাত্র মহাকাব্যিক উপন্যাস।

এ উপন্যাসের নায়ক গোরা সিপাহী বিদ্রোহের সময় নিহত এক আইরিশ দম্পতির সন্তান। এক ব্রাহ্মণ পরিবারের গোয়ালে তার জন্ম। জন্মের পরপরই মা মারা গেলে হিন্দু ব্রাহ্মণ দম্পতি কৃষ্ণদয়াল ও আনন্দময়ী তাকে পিতা-মাতা পরিচয়ে বড় করে। গোরা নিজের জন্মবিবরণ ও প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে জানে না। তার পালিত পিতা-মাতা কৃষ্ণদয়াল ও আনন্দময়ী দম্পতি না চাইলেও গোরা হিন্দু ধর্মের প্রতি অন্ধ সমর্থক হয়ে উঠে। গোরা কালক্রমে ইংরেজ বিরোধী বড় হিন্দু নেতা হয়ে যায়। জ্ঞানের নানা শাখায় বিচরণ সত্ত্বেও বর্ণপ্রথার কট্টর অনুসারী সে। বিনয় গোরা একনিষ্ঠ বন্ধু। তবে গোরার ছায়াতেই যেন ঢাকা পড়ে যায় বিনয়ের মেধা আর পরিচিতি। ঘটনাক্রমে গোরা ও বিনয়ের সাথে পরিচয় হয় পরেশ বাবু ও তার পরিবারের। পরেশ বাবুরা হিন্দু নন, ব্রাহ্ম। তার পরিবার বেশ মুক্তচিন্তার অধিকারী। পরেশ বাবুর দুই মেয়ে ললিতা ও সুচরিতার সাথে পরিচয়ের পর বিনয় আকৃষ্ট হয় তাদের আধুনিক চেতনার প্রতি। একই সাথে গোরাও সুচরিতার সাথে নিজের নানা ভাবনা বিনিময় করে। কথাবার্তা কিছু ক্ষেত্রে রূপ নেয় বাদানুবাদ আর মান অভিমানে।

সত্যযুগ ফিরিয়ে আনার জন্য ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন করে জেলে গেলে তার মনে হয় নানান বেজাতের সাথে থেকে তার জাত চলে গেছে। জাতশুদ্ধি করবে বলে ঠিক করে। বিশাল মাঠে তার সব চ্যালাদের নিয়ে সেই শুদ্ধির আয়োজনে সে ব্যস্ত। গোরার বাবা তখন মৃত্যু শয্যায়। সে গোরার মাকে ডেকে বলে কোন অব্রাহ্মণ জাতশুদ্ধি করতে পারে না। এ অধর্ম তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমি অনেক সহ্য করেছি কিন্তু তুমি গোরাকে না ফেরালে আমি তাকে বলে দিতে বাধ্য হব যে সে ব্রাহ্মণ তো নয়ই, হিন্দুও নয়। গোরা আড়াল থেকে সব শুনে ফেলে।

গোরার উপর পুরো বিষয়টি আসে দারুণ এক ধাক্কা হিসেবে। এতদিনের সব চিন্তা আর বিশ্বাস সবই কি ভুল? সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। পরে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে অন্ধত্ব ও সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে পৌছে যায় এক মহাভারতবর্ষের আদর্শের দিকে। নির্দিষ্ট ধর্ম থেকে মানবতার ধর্মে নিজেকে সে নতুনভাবে আবিস্কার করে। শুরু হয় জীবনের এক নতুন অধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র নিয়ে অদ্ভুত খেলতে জানতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় পুরো উপন্যাস জুড়েই। গোরা যেখানে কাহিনীময় জাতীয়তাবাদের মন্ত্র জপে, বিনয় এসে হাজির হয় তাঁর জ্ঞানের প্রকাশ ঘটাতে। অন্যদিকে ললিতাকে আমরা খুঁজে পাই নারীবাদের কণ্ঠরূপে। আর পরেশবাবু বিচক্ষণতার চাপ রেখেছেন তাঁর চরিত্রের মাঝে।

উপন্যাসটিতে ভারতের ইতিহাসের জটিল এক পরিবর্তনকে তুলে ধরা হয়েছে অসাধারণ নৈপুণ্যের সাথে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, হিন্দু মৌলবাদ আর ধর্মীয় সহিষ্ণুতার মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে। ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদানের পরস্পরবিরোধী অবস্থানকে রবীন্দ্রনাথ গোরা উপন্যাসের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তি সঙ্গে সমাজের, সমাজের সঙ্গে ধর্মের, ধর্মের সঙ্গে সত্যের বিরোধ ও সমন্বয় চিত্রিত হয়েছে। আর এর মাঝেই উঠে এসেছে মানবতার জয়গান।

আনোয়ারা

লেখকের নাম : মোহাম্মদ নজিবর রহমান
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪ (কলকাতা),
সংস্করণ : ২০১২
প্রকাশক : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন
পৃষ্ঠা : ২৮০
মূল্য : ২৭০ টাকা

মোহাম্মদ নজিবর রহমান (১৮৬০-১৯২৩) সাহিত্যরত্ন উনবিংশ শতাব্দীর বিকাশোন্মুখ মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি। তাঁর রচিত কালজয়ী উপন্যাস 'আনোয়ারা' (১৯১৪)। শতবছর আগে, যখন বাঙ্গালী মুসলমানদের লেখালেখি ও পড়াশুনার বিস্তার ছিল অপ্রতুল, তখন এরকম একটি উপন্যাস রচনা করা ও জনপ্রিয় হওয়া ছিল অসম্ভব ঘটনা। আনোয়ারা উপন্যাসটি শিল্পসম্মত উপন্যাস না হলেও বিষাদসিন্ধুর পর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জগতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ।

আনোয়ারা সামাজিক ও পারিবারিক চিত্রভিত্তিক উপন্যাস। উপন্যসের কাহিনী এরূপ- তরুণী আনোয়ারা সকাল বেলা ঘাটে গিয়ে কোরআন তিলাওয়াতের শব্দ

শুনতে পায়। পরে দেখতে পায় নুরুল ইসলাম কুরআন তিলাওয়াত করছে। আনোয়ারা মনে মনে এরকম একজন স্বামীর জন্য দোয়া করে। পরে নুরুল ইসলাম ও আনোয়ারার বিয়ে হয়। গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় রচিত এ উপন্যাসে দেখানো হয়েছে যে, একজন নারীর জীবনে স্বামী তার সব। স্বামীর জন্য দোয়া, স্বামীকে পাবার পর তার সেবাযত্ন, স্বামীর কথার বাইরে না যাওয়া এগুলোই উপন্যাসের মূল বক্তব্য। ইসলাম ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর ঘরের ভিতরে অবস্থান এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আস্থা ও সম্পূর্ণ আনুগত্য দেখানো হয়েছে। ধর্ম ও সত্যের জয়, অধর্মের পরাজয় এবং আনোয়ারার স্বামীনিষ্ঠা এ উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। এ উপন্যাসের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চরিত্রের মধ্যে রয়েছে- খাদেম, আজিমুল্লাহ, গোলাপজান প্রমুখ।

উপন্যাসে শব্দচয়ন, চরিত্রবিন্যাস ও কাহিনী বিনির্মাণে সমসাময়িক বাঙালি মুসলমান সমাজের পারিবারিক ও সামাজিক চিত্র উজ্জলভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। ঘটনার আবর্তে সে সময়কার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন কল্পনা ও স্থলন-পতনকে তিনি বাস্তবসম্মতভাবে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। পাশাপাশি মানবজীবনের কতগুলো চিরায়ত মূল্যবোধ যেমন প্রেম, ন্যায়পরায়ণতা ও মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ ইত্যাদি তার লেখায় যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাছাড়া কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে ব্যবসা, চাকুরী ইত্যাদিতে মুসলিমদের প্রবেশের সূচনাকালীন কথকতা থাকায় এবং মুসলমানদের ইংরেজী চর্চা আরম্ভ করার চিত্র থাকায় সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও উপন্যাসটি গুরুত্বপূর্ণ।

অন্তর্নিহিত গঠনকাঠামো ও কাহিনী বিন্যাস এ সবকিছু মিলিয়ে 'আনোয়ারা' সে সময়ে যেমন ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও জনপ্রিয় ছিল, শতবর্ষ পরেও পাঠকের কাছে প্রশংসিত। এ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিক মর্যাদা পেয়েছে। ১৯১৭-১৮ সালের দিকে আনোয়ারা উপন্যাসের পরিশিষ্ট বা সিকুয়্যাল হিসেবে 'প্রেমের সমাধি' প্রকাশিত হয়। ষাটের দশকে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক জহির রায়হান 'আনোয়ারা' উপন্যাস নিয়ে একটি সফল চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন এবং ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশন এর ধারাবাহিক নাট্যরূপ প্রচার করে।

পল্লী সমাজ

লেখকের নাম : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৬
সংস্করণ : ২০০৯
প্রকাশক : তিশা বুক ট্রেড
পৃষ্ঠা : ৬৬
মূল্য : ৭০ টাকা

উপনিবেশিক শৃঙ্খলাবদ্ধ ভারতবর্ষের ক্ষয়িষ্ণু সমাজের আর্তনাদকে অন্তরে ধারণ করে পীড়িত-বঞ্চিতদের ব্যাথার গল্প নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আগমন করেন অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)। বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের নানা টানাপোড়েনের পাশাপাশি সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সংকটকে তুলে এনেছেন তার লেখায়। এরই প্রেক্ষিতে উপনিবেশ শৃঙ্খলিত বাংলার পল্লী সমাজের অনাচার ও ক্ষুদ্র রাজনীতির পটভূমিকায় রচনা করেছেন 'পল্লী সমাজ' (১৯১৬) উপন্যাসটি। প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৯১৫ সালে। উপন্যাসে সকল অনাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে রমেশদের সচেতন দ্রোহ ও বিপ্লবের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র সংকট থেকে উত্তরণের উপায় নির্দেশ করেছেন। ফলে ঐ সময়ে উপন্যাসটি সাড়া ফেলে। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হলে, ঐ সময়ের আন্দোলনের ইশ্‌তেহাররূপে কর্মীদের মাঝে হাতে লিখিত কপি প্রচারিত হয়।

জমিদারদের নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বের মধ্যে পরে অসহায় প্রজাদের চিরকালের হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে পল্লী সমাজ উপন্যাসে। এই ফ্রেমে উপন্যাসের কাহিনী ধারায় বর্ণিত হয়েছে- বাংলার পল্লীজীবনের নীচতা ও ক্ষুদ্র রাজনীতির পটভূমিকায় এক আদর্শবাদী যুবক-যুবতীর সম্পর্ক ও বিশেষ করে তাদের অভিশপ্ত প্রেমকাহিনী। এখানে এসেছে মহাজন ও জমিদার শ্রেণীর চিরকালের স্বার্থান্বেষী চরিত্র । আগুনের শেষ, ঋণের শেষ আর শত্রুর শেষ রাখতে নেই- এ চিন্তাধারার মধ্যে পড়ে যায় প্রগতিশীল সকল আবেগ ও কার্যকলাপও তাতে নষ্ট হয় সমাজ বাধাগ্রস্থ হয় সমাজ সচেতনতা। তবু রমেশরা থেমে থাকে না। তারা আছে বলেই এসব উপন্যাসের নাম জয়ী কক্ষ। সেই আলোকেই আমারা বাস্তবজীবনেই স্বপ্ন দেখি। সমাজে এতসব ঘুণেধরা অনিয়ম তার সাথে প্রেমকে একই ফ্রেমে নিয়ে শরৎচন্দ্র পল্লী সমাজ নামক এক নিখুঁত স্কেচ এঁকেছেন।

পরিশেষে বলা যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুধু নারীর স্নেহশীলতা ও মানবিক হৃদয়াবেগের রূপকার নন, সামাজিক তথা জাতীয় অনাচার ও সংকটেরও সার্থক রূপকার। আর এ সংকটের শুধু বর্ণনাদাতাই নন, সংকট নিরসন চেষ্টার উপায় নির্দেশকও বটে।

শ্রীকান্ত

লেখকের নাম : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ধরন : আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস
প্রথম প্রকাশ : ১ম খন্ড১৯১৭,২য় খন্ড১৯১৮
৩য় খন্ড ১৯২৭,৪র্থ ১৯৩৩
সংস্করণ : ২০১২
প্রকাশক : ইউপিএল
পৃষ্ঠা : ৪৬০
মূল্য : ৪২৫ টাকা

বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে বাংলা কথাসাহিত্যের সূচনালগ্নে রবীন্দ্রনাথ নামক বটবৃক্ষের ছায়াতল থেকে বের হয়ে এসে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) গল্প বলার স্বকীয় ভঙ্গির মাধ্যমে পাঠকের কাছে হয়েছেন শ্রেষ্ঠ গল্প বলিয়ে। আর বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন অপরাজেয় কথাশিল্পী হিসেবে। তিনি লেখায় পীড়িতদের জন্য অনুকম্পা ও প্রবৃত্তি সংস্কারের দ্বন্দ্ব এক অনুপম কুশলী ভাষায় যথার্থ পরিবেশ সৃজনের মাধ্যমে প্রকাশ করে সচেতন সমাজমনস্ক সত্তার পরিচয় দেন।

তার রচিত 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি সাহিত্য সমালোচকগণের মতে আত্মজীবনীমূলক। এ উপন্যাসটি চারটি খণ্ডে (প্রথম খন্ড :১৯১৭, ২য় খন্ড:১৯১৮, ৩য় খন্ড:১৯২৭ এবং ৪র্থ খন্ড :১৯৩৩) বিভক্ত। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শ্রীকান্তে'র মধ্যে লেখকের ব্যক্তিজীবন প্রতিফলিত হয়েছে বলে সমালোচকগণ মনে করেন। ভ্রমণকাহিনী লক্ষণাক্রান্ত এ উপন্যাসের খন্ডগুলি কতক বিচ্ছিন্ন কাহিনীর সমষ্টি। তবে প্রতিটি খন্ডই শ্রীকান্তের স্মৃতিচারণ সূত্রে আবদ্ধ এবং লেখকের বর্ণনাগুণে হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শ্রীকান্তের জীবন অভিজ্ঞতার বর্ণনাচ্ছলে এতে বিচিত্র ঘটনা ও অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। সে সব ঘটনা ও চরিত্রের বাহুল্যের মধ্যে উপন্যাসের মূলসূত্র হিসেবে শ্রীকান্ত রাজলক্ষীর প্রণয় কাহিনী শেষ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে।

প্রথমপর্বটি সাজিয়েছেন ভ্রমণকাহিনী ও আত্মজীবনীর এক অভাবনীয় মিশেলে। শ্রীকান্ত এর ভবঘুরে জীবনের প্রতি আকর্ষণের আত্মভাষ্যে বিবৃত কার্যকারণ, শ্রীনাথ বহুরূপীর উপকাহিনী, সতীর্থ রাজপুত্রের আমন্ত্রণে শিকারে অংশগ্রহণকারী শ্রীকান্তের সাথে পিয়ারী বাইজী রূপিনী রাজলক্ষীর সাক্ষাৎ এবং রাজলক্ষী কর্তৃক শ্রীকান্ত পূর্নআবিস্কার। আবিষ্কারের পরে বাল্যপ্রণয় স্মৃতি এর

পূর্ণ জাগরণ এ আপ্লুত রাজলক্ষীর সম্মোহনী প্রভাবে শ্রীকান্ত এর শরণ প্রার্থনা এবং দার্শনিক মন্ডিত বিচ্ছেদ শ্রীকান্ত এর প্রথম পর্বের মূখ্য বিষয়। দ্বিতীয় পর্বের সূচনায় রয়েছে মাতৃপ্রতিশ্রুতির দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য পুনরায় পাটনা গমন এবং পরিশেষে রয়েছে সুদীর্ঘকাল পর স্বগ্রামে শ্রীকান্ত এর অসুস্থতার খবর শুনে লোকনিন্দা উপেক্ষা করে রাজলক্ষীর প্রত্যাবর্তন। রাজলক্ষীকে প্রতারণামূলকভাবে স্ত্রী হিসেবে সমাজে পরিচয় দান। আর এর মধ্যবর্তী সময়ে আছে শ্রীকান্তের বার্মা গমন। অভয়া ও রোহিনীকে নিয়ে এক কাহিনীর অবতারণা ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। তৃতীয় পর্বে শ্রীকান্ত রাজলক্ষীর সাথে পাটনা অভিমুখে স্বগ্রাম ত্যাগ এবং শ্রীকান্তের নিঃশর্ত আত্মসম্পন। সদ্য সুস্থ শ্রীকান্তকে নিয়ে রাজলক্ষীর জামিদারি দেখা শুনার জন্য পাটনা থেকে গঙ্গামাটি গ্রামে গমন ও বসবাস। চতুর্থ পর্ব ঘটনা বাহুল্যে পরিপূর্ণ। মুরারি পুরের আখড়ায় কমললতার সাথে শ্রীকান্তের পরিচয় ও ঘনিষ্টতার কাহিনী।

শ্রীকান্ত রাজলক্ষীর পাশাপাশি শ্রীকান্তের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রথম পর্বের ইন্দ্রনাথ ও অন্নদা দিদি, দ্বিতীয় পর্বের অভয়া, তৃতীয় পর্বের ব্রজানন্দ ও সুনন্দা এবং চতুর্থ পর্বের গহর ও কমললতার হারদিক ও সামাজিক সম্পর্কের বহুবর্ণিল বিষয় এতে চিত্রিত হয়েছে। সেই সঙ্গে তৎকালীন বাংলার আর্থসামাজিক অবস্থারও বাস্তবানুক চিত্র এতে অংকিত হয়েছে।

ছোটবেলা থেকেই শ্রীকান্তের ভবঘুরে জীবন। নানা বাড়িতে কেটেছে কৈশোর জীবন, এরপর কিছুদিন বাবার সাথে ঘুরেছেন, একসময় জীবিকার সন্ধানে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন এবং শেষে দেশ ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছেন বর্মা মুল্লুকে- এভাবেই কেটেছে তার জীবন। ছোটবেলার ভীতু শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের সহচর্যে হয়ে উঠেছে খেয়ালী। তাইতো জীবিকার তাগিদে গ্রহণ করা সন্ন্যাসগিরিতে ইস্তফা দেন মশার কামড় সইতে না পেরে, আবার জীবিকা অর্জনের জন্য বর্মা গেলেও ভালভাবে কাজ না খুঁজে দেশে চলে আসেন, আবার বর্মা যান এভাবে ঘুরেই জীবন কাটান, সংসারে আবদ্ধ হন না কখনো।

শ্রীকান্ত আত্মজীবনী জাতীয় রচনা। তবে বইটিতে ঘটনার সমাবেশ চোখে পড়ে না। লেখকের অনুভবজ্ঞান এবং আত্ম-আবিষ্কারের এক অপ্রকাশ মহাকাব্য এটি। কল্পনার চেয়ে এখানে অনুভূতির আন্তরিকতা বেশি। কাজেই শ্রীকান্ত একটি সাহিত্যিক-শৈল্পিক আত্মদর্শন, আত্মবিবরণ এবং আত্ম-প্রতিফলন। তবে কাহিনীটিতে উপন্যাসের মত করে চরিত্ররা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতকে সম্বল করে সামনে এগিয়েছে সমাপ্তির অনির্ধারিত পথে।

শ্রীকান্তের জীবনে চলার পথে প্রবেশ করেছে নানান নারী চরিত্র। অন্নদাদিদি, পিয়ারী, রাজলক্ষী, অভয়া, সুনন্দা, কমললতা। স্বাভাবিক সামাজিক অস্থিরতায় আচ্ছন্ন শ্রীকান্ত কোথায় বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে নি। কোন নারীর মনেও না; নারীর জন্যও না। নানা ঘটনার আবর্তে অসংখ্য নর-নারীর সংস্পর্শে এসে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তা-ই শ্রীকান্তের জীবনের মহামূল্যবান সম্পদ। এ যেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরই জীবনালেখ্য।

ভারতে তখন ইউরোপীয় ভ্রমণ কাহিনীর একপ্রকার সস্তা প্রচার ও বাজার পরিচিতি পাচ্ছিল। ওই সময় এই স্বদেশলগ্ন কথাকার ভারতের পরিবেশে ও বাস্তবতার আলোয় সাজিয়ে তুলেন দেশীয় ভ্রমণ সাহিত্য ও আত্মজীবনীর নিরাবেগ ও দরকারি ধারা। শ্রীকান্ত সেই ধারার প্রথম পদক্ষেপ। ব্যক্তিগত ভাবনা ও অনুভূতির সাথে লেখক সহজেই মিলিয়ে দিতে পেরেছেন প্রকাশশৈলী, বর্ণনাচাতুর্য, কাব্যময়তা আর চরিত্রকে তাদের আপন জায়গায় দাঁড় করিয়েছেন।

গৃহদাহ

লেখকের নাম	: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রথম প্রকাশ	: ১৯২০
সংস্করণ	: ২০০৯
প্রকাশক	: ইউপিএল
পৃষ্ঠা	: ২২৩
মূল্য	: ৩০০ টাকা

বাঙ্গালীর সমাজ সংস্কার ও সামাজিক দুঃখ বেদনাকে অবলম্বন করে যথার্থ বাস্তবতা ও হৃদয়াবেগের সার্থক রূপকার অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)। তার উপন্যাস সমূহের প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবন। এছাড়া সাধারণভাবে বস্তুবাদ ও আদর্শবাদের মধ্যে দ্বন্দ্বও তার উপন্যাসের একটি পরিচিত বিষয়। শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ (১৯২০) উপন্যাস দ্বিধান্বিত সত্তার তীব্র আত্মক্ষয়ী আর্তনাদ। সে আর্তনাদ অচলা চরিত্রটিকে ঘিরে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মহিম ও সুরেশ দুই পুরুষের প্রতি অচলার

আকর্ষণ-বিকর্ষণ উপন্যাসের মূলসূত্র। উপন্যাস শুরু হয়েছে মহিম আর অচলার বিয়ে দিয়ে। বিয়ের পরেই কাহিনীর যথার্থ সূত্রপাত। মহিম এবং সুরেশের প্রতি অচলার দোটানা আকর্ষণের মধ্য দিয়ে কাহিনী এগিয়েছে। বিয়ের পর মহিমকে ছেড়ে অচলা সুরেশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আবার সুরেশের প্রতি মোহভংগের পর মহিমের উপস্থিতিতে অচলার ভয়ানক একাকীত্ব ও দুঃসহ শূন্যতার মধ্যে উপন্যাসের ইতি ঘটেছে। একই ব্যক্তির প্রতি কখনো আসক্তি কখনো অনীহা এটা মনস্তত্ত্বের নিগুঢ় তথ্য যা অচলা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। গৃহদাহ উপন্যাসে অচলা, মহিম, সুরেশ প্রত্যেকের জীবন, অর্থনৈতিক পটভূমি, শিক্ষা দুর্বলচিত্ত ও পরিবেশগত ভিন্নতার চাপে অবিন্যস্ত হয়েছে।

এ উপন্যাসের হৃদয়, সমাজ, স্বামী, সংসার আর ভালবাসার শিখায় দাহ অচলার সমস্ত জীবন। অচলা মাতৃহীন পিতৃগৃহে মানসিক অসম্পূর্ণতায় লালিত। কেদার বাবুর সংসার অসংগঠিত। তিনি নিজেই অস্থিরচিত্ত পেটি বুর্জোয়া ধরণের, তার চিন্তা ভাবনা আচার আচরণও অবিন্যাস্ত। অচলা ছোট বেলা থেকেই তার বাবার দেয়া শিক্ষায় শিক্ষিত। তাই তার সত্তা, চিত্ত, মন সবই দোলাচলে আন্দোলিত। তাই প্রথম দিকে সুরেশের অসংযত আবেগদীপ্ত ব্যবহার বিরক্ত করেনি অচলাকে এবং তার প্রতি আমন্ত্রণও ছিল না, প্রত্যাখানও ছিল না। বিয়ের পর মহিমের সাথে গ্রামে এসে মৃনাল ও মহিমের সম্পর্কে কদর্য সন্দেহ সর্বোপরি মহিমের নিঃস্নেহ কঠোর কর্তব্য পরায়ণতা তার মনে প্রাণে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মহিম সর্বসময়ই ছিল নিরুত্তাপ আবেগহীন। অচলা মহিমকে একান্তভাবে পেয়েও তার প্রেমোচ্ছল হৃদয়খানি মেলে দিতে পারে নি। এরই সাথে সুরেশের আগমন এক সর্ব ব্যাপক অগ্নিশিখা তার লেলিহান জিহবা বিস্তার করে ক্রমাগত সুরেশ ও মহিমের জীবনকে যেমন গ্রাস করেছে তেমনি প্রজ্জলন্ত শিখায় অচলার জীবন, হৃদয় দ্বিধান্বিত সত্তা নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছে। নিজের অজান্তেই সুরেশের প্রবৃত্তিতে ইন্দন যোগিয়েছে।

গৃহদাহ উপন্যাসে শরৎচন্দ্র অচলা, মহিম, সুরেশ এর ত্রিভূজ প্রেমের কাহিনীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। মহিম সুরেশের মত দুই বিপরীত ধর্মী চরিত্রের সংযোজন করে তাদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ঘটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে অচলার ট্রাজিক পরিণতি সুনিপুন গল্প বিন্যাসে সাজিয়েছে। কথা সাহিত্যের ভাষা প্রকাশ ভঙি বিষয় আসয় এবং শিল্প বিন্যাসে গৃহদাহ শরৎচন্দ্রের এক অপূর্ব সৃষ্টি।

পদ্মরাগ

লেখকের নাম	: বেগম রোকেয়া
প্রথম প্রকাশ	: ১৯২৪
সংস্করণ	: ফেব্রুয়ারি ২০১২
প্রকাশক	: মনন প্রকাশ
পৃষ্ঠা	: ৯৮
মূল্য	: ১৪০ টাকা

মুসলিম নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) উপলব্ধি করেছিলেন নারী জাগরণের মূলমন্ত্র হচ্ছে নারী শিক্ষা। শিক্ষাই পারে নারীকে স্বাধীন ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে। তাই নারী শিক্ষা বিশেষভাবে মুসলিম নারী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে বিশ শতকের গোড়াতে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও সমাজসচেতনতার উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করেন। তার রচনাগুলোর তৎকালীন প্রেক্ষাপটের প্রয়োজনীয়তা সাহিত্যিক গুণকে ছাপিয়ে গেছে।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত পদ্মরাগ (১৯২৪) উপন্যাস হিসেবে পরিচিত। তবে সাহিত্য সমালোচকগণ একে উপন্যাস না বলে উপন্যাসোপম গদ্য-আখ্যায়িকা বলে অভিহিত করেছেন।

আটাশ পরিচ্ছেদের বিভক্ত এ গ্রন্থের শুরুটি অত্যন্ত নাটকীয় কিন্তু সাবলীল ও প্রাঞ্জল। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সিদ্দকা, যার প্রণয়প্রার্থী লতিফ। সিদ্দিকাকে ঘিরে বেশ কিছু চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। যাদের মধ্যে রয়েছে তারিনী, রফিকা, সৌদামিনী, সকিনা, হেলেন, ঊষা প্রমুখ। পদ্মরাগ উপন্যাসে ঘটনার আবর্তে আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে নারী চরিত্রের নানা প্রতিচ্ছবি। নারী চরিত্রের একই সঙ্গে কঠিন ও কোমল, প্রেমময়ী ও নিষ্ঠুর, উদ্যমী ও পশ্চাদপদ প্রভৃতি নানা দিক ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের পটভূমিতে উঠে এসেছে নারী সমাজের অসহায়ত্বের নানা দিক, তার প্রতি নির্যাতন ও নিপীড়নের দৃশ্যপট। তাই বলে উপন্যাসটি কোনভাবেই একঘেয়ে ও বিরক্তিকর নয়। পদ্মরাগ উপন্যাসে দীন তারিনীর আশ্রম তারিনী ভবন, সংলগ্ন বিদ্যালয় ও ক্লেশ নিবারণী সমিতির বিবরণ থেকে জানা যায় নারী উদ্যোগী ও পরিশ্রমী হয়ে কিভাবে নিজের পশ্চাদপদতাকে অতিক্রম করতে পারে। অতিক্রম করতে পারে সমাজের ভিত্তিহীন বিধানগুলোকে। নিজ পরিবর্তনে নারীর নিজের উদ্যোগী হওয়ার যে কোন বিকল্প নেই তা পদ্মরাগ উপন্যাস থেকে বুঝা যায় সিদ্দিকাসহ অন্য নারীদের জীবন যাপন ও চেতনা বিশ্লেষণ সাপেক্ষে।

'পদ্মরাগ' গ্রন্থে বেগম রোকেয়া প্রেমের আবহের মাঝে নারী জাগরনের চেতনাকে সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করেছেন। এক অদ্ভুত ভঙ্গিমায় উপস্থাপিত সিদ্দিকা ও লতিফের প্রেমের মাধ্যমে পাঠক নারী-পুরুষের প্রেমের এক ভিন্নমাত্রা দেখতে পায়। উপন্যাসের শেষাংশে দেখানো হয়েছে নারী কিভাবে আপন মহিমায় সব কিছুর উর্দ্ধে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। নারী চরিত্রকে মূল হিসেবে উপস্থাপন করলেও পদ্মরাগ উপন্যাস মূলত বাঙালি মুসলমান সমাজের জাগরণকে উৎসাহিত করেছে।

শিল্পকাঠামো বিচারে অসফল হলেও 'পদ্মরাগ' গ্রন্থের মূল্য অন্যত্র। এ গ্রন্থে তিনি একজন মুসলিম লেখিকা হিসেবে মুসলিম সমাজের অন্তঃস্থিত ক্লেদকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন যা কোন হিন্দু লেখকের পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং এতে রয়েছে অসাম্প্রদায়িকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তারিণীভবনকে কেন্দ্র করে ঈশান কম্পাউন্ডারের ভাষায় 'পদ্মরাগে' বলা হয়েছে যে, হিন্দু-মুসলিম-ব্রাহ্ম-খ্রিষ্টান একই মাতৃগর্ভজাত। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থের অবতারণা অংশে একটি চমৎকার গল্প আছে - এক মুসলিম ধর্মপিপাসু দরবেশের কাছে এলো শিক্ষা নিতে। দরবেশ তাকে নিজের হিন্দু গুরুর কাছে নিয়ে গেলেন। সেই হিন্দুগুরু আবার তাদের নিয়ে গেলেন নিজের মুসলিম গুরুর কাছে। এভাবে বুঝানো হলো প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে সম্প্রদায়জ্ঞান থাকে না। জ্ঞানের আলোকে কূপমন্ডুকতা দুর করতে হয়।

'পদ্মরাগ' গ্রন্থে বেগম রোকেয়া নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী সহবস্থান ও অসাম্প্রদায়িকজ্ঞানের সমন্বয়ে সচেতন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন তার জ্যেষ্ঠভ্রাতা আবুল আসাদ ইব্রাহিমকে।

বাঁধন হারা

লেখকের নাম : কাজী নজরুল ইসলাম
প্রথম প্রকাশ : ১৯২৭,
সংস্করণ : জুন ১৯৯২
প্রকাশক : আগামী প্রকাশনী
ধরন : পত্রোপন্যাস
পৃষ্ঠা : ১০৩
মূল্য : ১০০ টাকা

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে বিদ্রোহী কবি হিসেবে অতি পরিচিত কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) কথাসাহিত্যেও অবদান রাখেন। স্বল্প পরিসরে হলেও ছোটগল্প ও উপন্যাস ধারায় ছিল তাঁর সহজ পদচারণা। তাঁর লেখায় মানবিক অধিকার আদায়ের সোচ্চার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের পাশাপাশি মানব মনের চাওয়া, না পাওয়া ও হাহাকারের কোমল, ব্যথাতুর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদে যেমন কর্কশ তেমনি মানবহৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশে কোমল প্রকাশভঙ্গি ব্যবহার করেছেন। মানব মনের চাওয়া, না পাওয়ার আবেগনির্ভর কাহিনী নিয়ে রচিত 'বাঁধন হারা' উপন্যাস। উপন্যাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে পত্রালাপের মাধ্যমে। বিচ্ছিন্ন পত্রের মাধ্যমে উপন্যাস সৃষ্টির অভিনব কৌশলের স্বার্থক প্রয়োগ উপন্যাসটিতে হয়েছে। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস।

উপন্যাসের নায়ক নুরুল হুদা। এর কাহিনী এরূপ- পিতামাতাহীন নুরুল হুদাকে আবিস্কার করে রবিউল। তার বাড়িতে তাকে নিয়ে এসে আশ্রয় দান করা হয়। রবিউলের স্ত্রী রাবেয়া তাকে স্নেহ করে এবং শ্যালক মনুর সঙ্গে গড়ে ওঠে গভীর সখ্যতা। একসময় রবিউলের ছোট বোন সোফিয়ার বান্ধবী প্রতিবেশী মাহবুবার সঙ্গে নুরুল হুদার প্রণয় পূর্বরাগ দেখা দেয়। নুরুল হুদা ও সুন্দরী মাহবুবার প্রণয়দৃষ্টে ভাবী ও রবিউলের মধ্যস্ততায় বিয়েও ঠিকঠাক হয়ে যায়। তারপর রহস্যজনক কারণে বাঁধন হারা নুরুল কাউকে কিছু না বলে বিয়ে ভেঙে দিয়ে সেনাবাহিনীর কাজে যোগদান করে দূরে চলে যায়। আকস্মিক এ ঘটনায় মাহবুবার বাবার মনে আঘাত পান ও অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এসব ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাহিনী এগিয়ে যায়। পরে নুরুর প্রেমিকা পিতৃহীনা অপরুপা সুন্দরী মাহবুবার বিয়ে হয় এক বৃদ্ধ জমিদারের সাথে। কিছুদিনের মধ্যে মাহবুবা বিধবা হয়। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে জামিদারি পায়।

এ দিকে বাধঁন হারা নুরুর নীরব হাহাকার আর বেদনার মাঝে সেনাবাহিনীর জীবন শেষে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি।

বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে পত্রালাপের মাধ্যমে পুরো উপন্যাসটি বর্ণিত। নুরুর প্রথমপত্র থেকেই সৈনিক জীবনের অসামান্য বর্ণনায় হিউমারের সন্ধান পাওয়া যায়। সৈনিক জীবনের কিছু আনন্দ বেদনা গল্প শুনিয়েছে ঔপন্যাসিক অত্যন্ত দরদের সাথে। আবেগঘন কাহিনীর মাঝে এর রস ও হিউমার উপন্যাসটিকে আকর্ষণীয় করে।

নুরু মাহবুবার ভালবাসা, অজানা রহস্যজনক কারণে ভেঙে দিয়ে বাঁধন হারা নুরুর দূরে সেনাবহিনীর চলে যাওয়া, তবু নুরুর সেই ভালবাসার ব্যথা বয়ে চলা, নুরুর জন্য সোফিয়ার গোপন না বলা ভালবাসা কেউ কাউকে না পাওয়া হাহাকার এমনি অনেক ব্যাথার ছবি উপন্যাসিক অত্যন্ত সংবেদনশীল লেখনি দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। যা পাঠককে আপ্লুত করে। বাঁধন হারা উপন্যাসের বাধন অনেকটাই শীতল। চরিত্রে হয়েতো কোন মহৎ শিল্পের রেখাপাত ধরে নির্দিষ্ট পথে পৌছানোর চেষ্টা নেই। অজস্র কথার ভীড়ে বর্ণনার বাহুল্যে একেকটি ব্যক্তিত্বের গুঞ্জন মাত্র শুনা যায়। তাতে উপন্যাসের রস আস্বাদনে কোন ব্যত্যয় ঘটে না। অন্যান্য চরিত্র অস্পষ্ট ও স্বাতন্ত্র বর্জিত হলেও কোন কোন চরিত্রে টানাপোড়েন বিশেষ করে নায়ক ও তার প্রেমিকা আমাদের ভাবায় ও কাঁদায়। উপন্যাসিকের আন্তরিকাতায় উপন্যাসের পরিণতি পাঠকের মন ছুঁয়ে যায়। তবে কোথাও স্থির না হওয়া এ যুবক অর্থাৎ উপন্যাসের নায়ক নুরুল হুদা চরিত্রে যে উপন্যাসিক নজরুল ইসলামের ছায়া আছে তা সচেতন পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না।

শেষের কবিতা

লেখকের নাম : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রথম প্রকাশ : ১৯২৯
সংস্করণ : মে, ২০০৮
প্রকাশক : নাঈম বুকস ইন্টারন্যাশনাল
পৃষ্ঠা : ১০৮
মূল্য : ৮০ টাকা

বাংলা উপন্যাসশিল্প উনিশ শতকের মধ্যভাগে প্যারীচাঁদ মিত্রের হাতে জন্মলাভ করে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে সার্থক রূপ গ্রহণ করে এবং বিকাশ ও প্রসার লাভ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) হাতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য বাংলার উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসীয় জীবনবোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের চেতনা এবং মানুষের আত্মানুসন্ধানের গভীর বিন্যাস। বাংলার নবশিক্ষিত অভিজাত সমাজের জীবনকথা নিয়ে তিনি রচনা করেছেন 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) উপন্যাসটি। লেখা ও প্রকাশের দিক থেকে এটি রবী ঠাকুরের দশম উপন্যাস। প্রবাসী পত্রিকায় ছাপা হয় ১৯২৮ সালে।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অমিত রায়। খুব প্রভাশালী ধনী পরিবারের ছেলে। বাবা তাকে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেতে পাঠায়। বিলেতে ছাত্র অবস্থাতেই তার বন্ধুর চেয়ে বান্ধবীর সংখ্যা বেশি ছিল। এদের মধ্যে কেতকী তার বোনের বান্ধবী। এসময়ই প্রেম গড়ে তুলেছিল এবং অমিতের দেওয়া আংটিও হাতে পরেছিল। ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে এসে অমিত পেশায় মনোযোগ না দিয়ে বান্ধবীদের নিয়ে কলকাতার পাহাড় পর্বতে পিকনিক করে বেড়ায়। মেয়েদের ব্যাপারে তার আগ্রহ, আছে উৎসাহ নেই। অনেকটা বিলেতী ধাঁচের। ধৈয্য ধরে কাউকে সময় দিতে সে অপারগ। মেয়েদের সাথে সম্পর্ক গড়তে এবং ভাঙতে তার খুব একটা সময় লাগে না।

এই অমিত একবার শিলং পাহাড়ে বেড়াতে যায়। শিলংয়ে এসে প্রথমেই পাহাড়ে একটি গাড়ির সাথে ধাক্কা লাগে। সেই গাড়ী থেকেই বেরিয়ে উপন্যাসের মূল নায়িকা লাবণ্য। লাবণ্যের বাবা অবনীশ দত্ত কলেজের অধ্যক্ষ। অবনীশ দত্ত তার মাতৃহীনা মেয়েকে বছরের পর বছর শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলেছেন। উপন্যাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র অবনীশ দত্তের ছাত্র শোভনলাল। শোভনলাল লাবণ্য একই বয়সের। দুজনের মধ্যে বাল্য-প্রেম না থাকলেও শোভনলাল লাবণ্যকে ভালবাসত। লাবণ্য শোভনলালকে কখনো

প্রশয় দেয় নি। ঐ ঘটনার পর অমিতকে মনে ধরে লাবণ্যর এবং সে অমিতকে ভালবেসে ফেলে। তাদের প্রেম এগিয়ে যেতে থাকে জ্যামিতিক হারে। কিন্তু অচিরেই বাস্তববাদী লাবণ্য বুঝতে পারে অমিত একেবারে রোমান্টিক জগতের মানুষ, যার সঙ্গে প্রতিদিনের সংসারের হিসেব নিকেশ চলে না। ইতোমধ্যে শিলংয়ে হাজির হয় কেতকী। হাতে অমিতের দেওয়া আংটি। অমিতকে সে নিজের বলে দাবি করে। ভেংগে যায় লাবণ্য-অমিতের বিবাহ আয়োজন। শেষ পর্যন্ত অমিত স্বীকার করে যে লাবণ্যের সাথে তার প্রেম যেন ঝরণার জল প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য নয়। আর কেতকীর সাথে সম্পর্ক ঘড়ায় তোলা জল, যা প্রতিদিনের পানের উদ্দেশ্যে।

শেষের কবিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস অথচ তিনি তাঁর রচনার নাম দিয়েছেন শেষের কবিতা। উপন্যাসটির যবনিকাপাতও হয়েছে প্রাণস্পর্শী একটি কবিতা দিয়ে .... 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও'। এ উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভাষা, বিষয়বস্তু, ঘটনা পরম্পরায় মধুরতা, অস্থিসন্ধি এবং পাত্র-পাত্রীর সংলাপ সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে কাব্যময়তা। উপন্যাসটির কাহিনী এবং ঘটনার সূত্রপাত প্রেমানুভূতি হলেও এই প্রেমের সিদ্ধান্ত প্রচলিত মানানসিদ্ধ ছিল না। তা ছিল নতুন ধারা সৃষ্টির, নতুন ফলাফলের।

উপন্যাসের কয়েকটি বাক্য আজ প্রবাদে পরিণত হয়েছে। যেমন- 'ফ্যাশনটা হলো মুখোশ স্টাইলটা হলো মুখশ্রী', 'পুরুষ আধিপত্য ছেড়ে দিলেই মেয়ে আধিপত্য শুরু করবে', 'বিধাতার রাজ্যে ভালো জিনিস অল্প হয় বলেই তা ভালো', 'ভালোবাসা খানিকটা অত্যাচার চায় অত্যাচার করেও' ইত্যাদি। বরীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের ছবি আকার কালে কথা সাহিত্যের চিত্রধর্মে কিছু কিছু নতুনত্ব দেখা গেছে, যা আগে ঠিক এমনভাবে দেখা যায় নি। কলমের স্বল্প আচড়ে বক্তব্যকে নিশ্চিতভাবে চোখের সামগ্রী করে তোলার এক বিশেষ ঝোঁক এবং সেই সঙ্গে দক্ষতা চোখে পড়ে। ১৯৪৬ সালে শেষের কবিতা ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় Farewell, My Friend শিরোনামে। শেষের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ষোলটি কবিতা এবং মোট তিনশত চুরানব্বইটি কাব্যচরণ ব্যবহার করেছেন। এ উপন্যাসে ব্যবহৃত কাব্যচরণ একটি কাব্যগ্রন্থ রচনার জন্যও যথেষ্ট। তাছাড়া এ উপন্যাসের গদ্যে রয়েছে কাব্যময়তা। তাই একে কাব্যপোন্যাসও বলা হয়।

পথের পাঁচালী

লেখকের নাম	: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রথম প্রকাশ	: ১৯২৯
সংস্করণ	: বইমেলা, ২০০৯
প্রকাশক	: বিশ্বসাহিত্য ভবন
পৃষ্ঠা	: ১৯২
মূল্য	: ১৪০ টাকা

বিশ শতকের প্রথমভাগে সাধারণ ব্যক্তি জীবনের খুটিনাটি বিশ্লেষণ ও প্রকৃতির নিবিড় বীক্ষণের মধ্য দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে নিজেকে আলাদা করে পরিচিত করান বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)। উপনিবেশিক শোষণে ভগ্নপ্রায় ভারতবর্ষের সকলে যখন ব্রিটিশদের অনুসারী-অনুকারী হওয়ার জন্য পুরোপুরিভাবে ইংরেজী শিক্ষামুখী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন প্রচণ্ডভাবে।

ভারতবর্ষের সর্বত্র যখন উপনিবেশিক শোষকদের কর্তৃত্ব বিরাজ করছিল তখন তিনি তীব্রভাবে এর বিরোধিতা করেন। আর এ বিরোধিতা করেন একান্তভাবে এদেশের প্রকৃতি মুখী হয়ে, যা শোষকরা চাইলেও পরিবর্তন করতে পারবে না। তিনি প্রকৃতির মধ্যে লীন হতে চাইলেন। ফলস্বরূপ তার কথাসাহিত্য হয়ে উঠল প্রকৃতির নিবিড় পরিচায়ক। প্রকৃতির এই বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা তিনি দিয়েছেন ব্যক্তিজীবনের প্রতিদিনের যাপিত জীবনের বর্ণনায় ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে। আর অনিবার্য কারণবশতই তার লেখায় পড়েছে আত্মজীবনের ছায়া। আত্মজীবনের ছায়ায় ব্যক্তির পারিবারিক জীবন বর্ণনায় ভারতবর্ষের প্রকৃতির সূক্ষ্ম ও অপরূপ বর্ণনা সমৃদ্ধ তার প্রথম উপন্যাস পথের পাচালী (১৯২৯)। প্রথম উপন্যাসের মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী অবস্থান করে নেন। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় সজনীকান্ত দাসের রঞ্জন প্রকাশলায়, কলকাতা থেকে।

কাহিনীর পটভূমিতে আছে বিশ শতকের শরুর দিকে বাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অপু ও তার পরিবারের জীবন যাত্রার কথাই পথের পাঁচালী উপন্যাসের মূখ্য বিষয়। অপুর বাবা হরিহর রায় তার পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন। তিনি পেশায় পুরোহিত। আয় সামান্য, লেখা পড়া জানেন। তাই তিনি কিছু ভাল যাত্রাপালা লিখে অধিক উপার্জনের স্বপ্ন দেখেন। তিনি অত্যন্ত

ভাল মানুষ ও লাজুক প্রকৃতির লোক। তাই সহজে সকলে তাকে ঠকিয়ে নেয়। পরিবারের তীব্র অর্থ সংকটের সময় তিনি তার প্রাপ্ত বেতন আদায় করার জন্য নিয়োগকর্তাকে তাগাদা দিতে পারেন না। হরিহরের স্ত্রী সর্বজয়া তার দুই সন্তান দূর্গা ও অপু এবং হরিহরের দুর সম্পর্কের পিসি ইন্দির ঠাকুরণের দেখাশুনা করেন। দরিদ্রের সংসার বলে নিজের সংসারে বৃদ্ধ ইন্দির ঠাকুরনের ভাগ বসানোটা তিনি ভালভাবে নিতে পারেন না। সর্বজয়া এমন আচরণ অসহ্যবোধ হলে ইন্দির মাঝে মাঝে অন্য আত্মীয়র বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিতেন। অন্যদিকে দুর্গা পরশীর বাগান থেকে ফলমূল চুরি করে আনে ও ইন্দির ঠাকুরণের সাথে ভাগাভাগি করে খায়। পরশীরা এসে সর্বজয়াকে গঞ্জনা দেয়। তাদের দারিদ্র্যের সুযোগে ধনী পরশীরা দুর্গাকে চোর সাবস্ত্য করতেও ছাড়ে না।

ভাই বোন অপু ও দুর্গার মধ্যে খুব ভাব। দুর্গা ভাই অপুকে খুব ভালবাসে তবে মাঝে মধ্যে তাকে ক্ষেপিয়ে তুলতেও ছাড়ে না। তারা কখনো কখনো চুপচাপ গাছতলায় বসে থাকে, কখনো মিঠাইওয়ালার পিছে পিছে চুটে, কখনো ভ্রাম্যমান বায়োস্কোপওয়ালার বায়োস্কোপ দেখে বা যাত্রাপালা দেখে। সন্ধ্যাবেলা দুজনে। দুরাগত ট্রেনের বাঁশি শুনতে পায়। একদিন তারা বাড়িতে না বলে ট্রেন দেখার জন্য অনেক দূর চলে আসে। আবার একদিন জঙ্গলের মধ্যে খেলা করতে গিয়ে তারা ইন্দি ঠাকুরনকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। গ্রামে ভাল উপার্জন করতে না পেরে হরিহর ভাল কাজের আশায় শহরে যায়। হরিহরের অনুপস্থিতিতে বাড়ির অর্থ সংকট তীব্রতর হয়। সর্বজয়া একাকীত্ব বোধ করতে থাকে। বর্ষাকালে একদিন দুর্গা অনেকক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর বাধায়। ঔষধের অভাবে তার জ্বর বেড়েই চলে এবং ঝড়ের রাতে দুর্গা মারা যায়। এরপর একদিন হরিহর ফিরে আসে শহর থেকে যা কিছু নিয়ে আসে সর্বজায়া কে দেখাতে থাকে। প্রথমে সর্বজয়া চুপ করে থাকে পরে স্বামীর পায়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। হরিহর বুঝতে পারে যে সে তার একমাত্র কন্যাকে হারিয়েছে। তারা ঠিক করে যে গ্রাম ও পৈত্রিক ভিটা ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে অন্য কোথাও চলে যাবে।

তারা কাশীতে গিয়ে বসবাস শুরু করে। তাদের জীবনে কিছুটা স্বচ্ছলতা আসতে না আসতেই মারা যায় পিতা হরিহর। সর্বজয়া অন্যের বাড়ীতে রান্নার ঠাকুর হিসেবে কাজ নেয়। অপু বড় হতে থাকে প্রকৃতির প্রতি দুর্বার আকর্ষণ নিয়ে এবং তার মন পরে থাকে নিশ্চিন্দিপুরে। এভাবে সামাজিক চিত্রসৃষ্টি দিয়ে 'পথের পাঁচালীর' গোড়াপত্তন, দূর অতীতের সাথে পল্লী বাংলার জীবনের

গ্রামীণ যোগ দিয়ে লেখক গল্প শুরু করেছেন। পল্লী সমাজের আচার-ব্যবহার, পল্লীপথ, বন-বাদাড়, মাঠ-ঘাট, নদী-প্রান্তর, পূজা-পার্বণ প্রভৃতির ছবি একেছেন। যেসবের মধ্য দিয়ে গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন চলাফেরা তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু নিয়ে 'পথের পাচালী' সমৃদ্ধ। প্রকৃতিই এর নায়ক অপুর গুরু, বন্ধু। গ্রাম বাংলার মূক প্রকৃতি এ উপন্যাসের বিশেষ চরিত্র হিসেবে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতি জগৎ আর মানবজীবন এক হয়ে যেন কোন অপরিচিত রহস্যেময় অনন্তের দিকে ছুটেছে।

লেখক তুচ্ছ ছোটখাট ঘটনা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনের গভীর মর্ম-রহস্য উদঘাটন করেছেন। বিষয়-ভাবনা, চরিত্র, জীবনের সকল ব্যথা ও কথা সহজ স্বচ্ছন্দ গতি এবং শিল্পরীতি, পথের পাঁচালীকে উচ্ছল ও অনন্য উপন্যাস করে তুলেছে।

মৃত্যুক্ষুধা

লেখকের নাম : কাজী নজরুল ইসলাম
প্রথম প্রকাশ : ১৯৩০
সংস্করণ : ৯ম, ২০১৫
প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স
পৃষ্ঠা : ৮০
মূল্য : ১৮৫ টাকা

বিদ্রোহী কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) কালজয়ী উপন্যাস 'মৃত্যুক্ষধা'। এ উপন্যাসটি নজরুলের বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত। ১৯২৭-১৯২৯ সাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরে বাস করতেন। এ নগরের চাঁদসড়কের ধারে বিরাট কম্পাউন্ডওয়ালা একতলা বাংলো প্যার্টানের একটি বাড়িতে তিনি থাকতেন। মৃত্যুক্ষধা উপন্যাসের পটভূমি উক্ত বাড়ি, ওমান কাথলি পাড়া এবং কলকাতার পারিপার্শ্বিক এলাকা। এ উপন্যাসের প্রথমাংশ কৃষ্ণনগর ও শেষাংশ কলকাতায় রচিত। মৃৎশিল্পের কেন্দ্রভূমি কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়ক। পশ্চিমবঙ্গের এ চাঁদসড়কের দরিদ্র হিন্দু-মুসলিম-খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের দারিদ্র ও দুঃখ ভরা জীবন নিয়ে উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে। কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে নিদারুন দুঃখ কষ্ট এবং দুঃসাধ্য কৃচ্ছ্রসাধন ছিল নজরুলের নিত্য জীবনযাত্রার অঙ্গ। তাই দারিদ্রের চিত্র, সাম্য ও বিপ্লবীচেতনা এ উপন্যাসের রূপকল্পের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'মৃত্যু' ও 'ক্ষুধা'। চাঁদসড়কের নিম্নশ্রেণীর মানুষদের একদিকে মৃত্যু আরেক দিকে ক্ষুধা। সেখান থেকে উপন্যাসের নামকরণ 'মৃত্যুক্ষুধা'। নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলো অভাবের কারণে ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করে, আবার পরস্পরের দুঃখে একে অপরের পাশে এসে দাঁড়ায়। উপন্যাসের কাহিনীতে দেখা যায়- মৃৎশিল্পের কেন্দ্রভূমি কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়ক। এ সড়কের বস্তি এলাকায় বাস করে একটি দরিদ্র মুসলিম পরিবার। উপন্যাসের এক অন্যতম প্রধান চরিত্র এই পরিবারের সদস্য গজালের মা। শুরুতেই কলতলায় হিন্দু হিড়িম্বার সাথে ঝগড়ার মাধ্যমে তার সাথে পাঠকের পরিচয় ঘটে। তার তিন ছেলে মারা গেছে যৌবন বয়সে। রেখে গেছে তিন বিধবা স্ত্রী (বড় বউ, মেঝো বউ, সেজো বউ) আর তাদের প্রায় এক ডজন ছেলে মেয়ে। ছোট ছেলে প্যাঁকালে রাজমিস্ত্রীর কাজ করে। সবার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব প্যাঁকালের উপর। এমন পরিস্থিতিতে স্বামীর ঘর ছেড়ে আসা ছোট মেয়ের

প্রসব বেদনা শেষে এক ছেলের জন্ম হয়। শত দুঃখের মাঝেও সে এক আনন্দ। এভাবে সব দুঃখ আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট আনন্দের মধ্য দিয়ে কাহিনী এগিয়ে চলে। এ উপন্যাসের দুটি অংশ। প্রথম অংশে দেখা যায়- কুর্শি খ্রিষ্টান হলেও প্যাঁকালের ভালবাসার জন্য ব্যাকুল। কুর্শিকে পাওয়ার জন্য প্যাঁকালেও ধর্মান্তরিত হয়। উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশ আছে আনসার-রুবির প্রসঙ্গ। সমাজকর্মী, দেশপ্রেমিক, আত্মত্যাগী ও সংসার বিরাগী আনসার কৃষ্ণনগর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের তরুণী কন্যা রুবিকে ভালবাসত। রুবিও আনসারকে ভালবাসত। রুবির পরিবার জোর করে তাকে বিয়ে দিয়েছিল এক অর্থলোভী যুবকের সাথে কিন্তু সংসার টিকেছিল মাত্র একমাস। রুবির স্বামী মারা গেলে রুবি বিধবা হয়ে যায়। এদিকে আনসার রাজবন্দী থাকা অবস্থায় ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়। আনসারের অসুস্থতার খবর শুনামাত্র রুবি ছুটে যায় তার কাছে। আনসারকে বাঁচাতে রুবি অক্লান্ত পরিশ্রম করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় আনসার মারা যায়। আনসারের সেবাযত্নের ফলে রুবিও একই রোগে আক্রান্ত হয়। সেও মারা যায়। ওদিকে অভাবের তাড়নায় মেঝ বউ খৃষ্টান হয় এবং বরিশালে নিজের জীবন কাটিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। কিন্তু সন্তানদের জন্য তাকে আবার বস্তিতে ফিরে আসতে হয়। প্যাঁকালেকে খাঁন বাহাদুর সাহেব কুড়ি টাকা বেতনের চাকুরী দিলে সে কুর্শিকে নিয়ে মুসলমান হয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এভাবেই উপন্যাসের কাহিনী শেষ হয়।

এ উপন্যাসে দরিদ্র পরিবারের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও মমতা, বিশেষ করে দাদীর মমতা আমাদের আনন্দ দেয়। রুগ্ন সেজো বউয়ের মৃত্যু আমাদের ব্যথাতুর করে। প্যাঁকালে ও খ্রিষ্ঠান মেয়ে কুর্শির প্রেম আমরা দেখি। বিধবা মেজো বউ অপরূপ সুন্দরী। তার বোনের স্বামী গিয়াস উদ্দিন তাকে বিয়ে করতে খুবই আগ্রহী।

এমন দুর্দশাগ্রস্থদের খ্রিষ্টান মিশনারীরা সাহায্যের আড়ালে ধর্মান্তকরনের প্রয়াস চালায়। তাদের কৌশলে মেঝো বউ শেষে খৃষ্টান হয়ে যায়। তার নাম হয় হেলেন। সন্তানদের রেখে সে অন্যত্র চলে গিয়েও ফিরে আসে। এ উপন্যাসের কৃষ্ণনগর ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের নির্মম শিকার অখন্ড বঙ্গের এক খন্ড প্রতীকি বাস্তবতা।

উপন্যাসের চরিত্রগুলো অসাধারণ মমতায় এঁকেছেন উপন্যাসিক। বাস্তবজীবনের আলেখ্য অসহায় দরিদ্রদের জীবনের আনন্দ বেদনা নিয়ে মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাস এক অপরূপ সৃষ্টি। এর মাধ্যমে আরো ফুটে উঠেছে যে, ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে আল্লাহ, ভগবান বা যিশুখ্রিষ্টের কোন ফারাক নেই। এ উপন্যাসটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের রচনা। এ কারণে যুদ্ধোত্তর যুগের অর্থসংকট, শ্রেণীবৈষম্য, নগরচেতনার প্রকাশ এবং উপলব্ধির সার্থক প্রয়াস।

কুহেলিকা

লেখকের নাম : কাজী নজরুল ইসলাম
প্রথম প্রকাশ : ১৯৩১
সংস্করণ : আগষ্ট ২০০৪
প্রকাশক : স্টুডেন্ট ওয়েজ
পৃষ্ঠা : ১৩০
মূল্য : ১২৫ টাকা

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে সকল পরাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এক প্রচণ্ড কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয় বাংলাসাহিত্যে। সেই কণ্ঠস্বরের নাম কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। সাহিত্যাঙ্গনে বিদ্রোহী কবি হিসেবে আগমন করলেও কথাসাহিত্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। স্বল্প পরিসরে হলেও ছোটগল্প ও উপন্যাস ধারায় ছিল তাঁর সহজ পদচারণা। নজরুলের উপন্যাস চিন্তার সবশেষ প্রকাশ 'কুহেলিকা'। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে নওরোজ পত্রিকার পাঁচটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলে সাপ্তাহিক সওগাত পত্রিকায় উপন্যাসের বাকী অংশ প্রকাশিত হয়।

কুহেলিকা উপন্যাসের মূল চরিত্র জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীরের বন্ধু হারুণ। তরুন কবি হারুনের মেসে তার নারী কুহেলিকা মতের উপর তার সঙ্গীদের মজার বিতর্কের মাধ্যমেই কাহিনীর শুরু। এ নারীকে নিয়েই উপন্যাসের কুহেলিকা নামকরণ। এ সঙ্গীদের মধ্যে জাহাঙ্গীর যে স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষিত। দেশ উদ্ধারের জন্য বিপ্লবী সংঘের সদস্য। তার কর্মকান্ড, তার সঙ্গীদের, তার জীবনের নারী চম্পা, ভুণি এদের নিয়ে উপন্যাসের কাহিনী এগিয়ে চলে। জাহাঙ্গীরের দীপান্তরে উপন্যাসের সমাপ্তি। উপন্যাসের লেখকের নিজস্ব জীবন দর্শন ও বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা যায়। এ উপন্যাসে সে যুগের যুব-মানুষের রক্ত চাঞ্চল্য অনুভূত হয়।

উপন্যাসের রূপকর্ম সম্পর্কে বলা যায়। কুহেলিকা সাময়িক উপন্যাসের গোত্রভূক্ত হলেও কাহিনী পরিচর্যায় লেখকের মুন্সিয়ানা রয়েছে। ভাষা এখানে যেমন ব্যঙ্গ-হাস্যরস ও প্রাণের স্পর্শে জেগে উঠেছে। তেমনি বর্ণনা রীতিতে রয়েছে। মিথ-কথনের প্রয়াস। কবিত্বময় ভাষা এখানে স্বাস্থ্য আর লাবণ্যে বেশ দ্যুতিময়। নজরুলের উপন্যাসের বাক্য অনেক ছোট। প্রথম লাইন থেকে নজরুলের উপন্যাসের কাহিনী শুরু হয় এবং পাঠকে কৌতুহলী করে তোলে।

পাঠক তার উপন্যাসের গল্পে নিমগ্ন থাকে। মাঝে মধ্যে তার উপন্যাসের বাক্যাবলী উজ্জল কৌতুকের রস ছড়ায়। তার উপন্যাসে সমাজ সচেতনতা মানুষের প্রতি ভালবাসা, দরদ নরনারীর প্রেমের প্রতি দরদী মনোভাব পাঠককে মুগ্ধ করে।

এ উপন্যাসের সংলাপগুলো গভীর মনস্তাত্বিভাব প্রকাশ করে। যা পাঠকের গভীর অনুভূতি সৃষ্টি করে। উপন্যাসে সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটই মূলত উন্মোচিত হয়েছে। তবে ঘটনার বিন্যাস সমকালীন নানা সমাজচিত্র এবং অর্থনৈতিক চিত্রও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। মনে হবে এ উপন্যাস শুধু নজরুলের সময়কার প্রেক্ষাপট নয় বরং বর্তমান সময়ের নিম্নবিত্ত বাঙালির বাস্তব রূপটা ফুটে উঠেছে। এই উপন্যাসকে প্রকৃত বাঙালি সমাজের অদ্ভুত প্রকাশ বলা যেতে পারে। এছাড়াও নারীর মন বিশ্লেষণ, জমিদারদের দাপট, হিন্দু মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কে হীনমন্যতা ও সর্বোপরি সমকালীন স্বদেশী, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের উপর উপন্যাসটিতে যে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে তাতে উপন্যাসটি সমকালীন শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের দাবীদার।

আবদুল্লাহ

লেখকের নাম : কাজী ইমদাদুল হক
প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৩
সংস্করণ : ২০১৩
প্রকাশক : অ্যাডর্ণ পাবলিকেশন
পৃষ্ঠা : ১৭০
মূল্য : ২৩০ টাকা

বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে যে সকল বাঙালী মুসলমান মননশীল গদ্য লেখক বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬) অন্যতম। তার একটি মাত্র অসমাপ্ত উপন্যাস আব্দুল্লাহ রচনা করে তিনি যে কৃতিত্বের নির্দশন রেখে গেছেন বাংলা সাহিত্যে তিনি চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

কিডনি সমস্যার কারণে কাজী ইমদাদুল হককে প্রায় ৬ মাস কলকাতা মেডিকেলে থাকতে হয়েছিল। সে সময়ই তিনি আব্দুল্লাহ উপন্যাস রচনা শুরু করেন। কিন্তু স্বাস্থ্য ক্রমাগত ভেঙ্গে পড়ায় তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি।

তিনি উপন্যাসে ত্রিশটি অধ্যায় সমাপ্ত করেছিলেন। বাকী ১১টি অধ্যায়ের খসড়া রেখে গিয়েছিলেন। তার রেখে যাওয়া খসড়া অবলম্বনে তার জ্যেষ্ঠপুত্র কাজী আনোয়ারুর কাদির উপন্যাসটি শেষ করেন। কাজী আনোয়ারুল কাদিরের রচিত অংশের পরিমার্জনা করেন কাজী শাহাদাৎ হোসেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালী মুসলমান সামাজে যে অবস্থা ছিল তার একটি নিখুঁত চিত্র আব্দুল্লাহ উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। চিত্রাঙ্কনের সাথে যুক্ত হয়েছে লেখকের সমাজ সমালোচনা। সমাজে আশরাফ আতরাফ ভেদ, পর্দা প্রথা, পীর ভক্তি, সুদ সমস্যা, হিন্দু-মুসলিম তিক্ততা, ইংরেজি শিক্ষার নিন্দাবাদ এসকল সমস্যা সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে যে বিরোধ ও বাধার সৃষ্টি করেছিল তার একটি উত্তম আলেখ্য আব্দুল্লাহ।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ধর্মপ্রাণ মুসলমান কিন্তু কুসংস্কার বিরোধী। তার মতে পীর মুরীদি হল হিন্দুদের পুরোহিতদের অনুকরন। ইসলামে তার কোন স্থান নেই। কাসেম গোলদারের বাড়িতে অলৌকিক ক্ষমতার গল্প শুনে তার মনে বিস্ময় জাগে। পীর হওয়ার সহজ পথ ত্যাগ করে আব্দুল্লাহ চাকুরী করে উপার্জন করতে ব্রত হয়। সৈয়দ সাহেবের মাদ্রাসায় এদের পাঠদানের বৈষম্য দেখে আব্দুল্লাহ বিস্মিত হয়। মৌলভী সাহেবকে এর কারণ জিজ্ঞেস করে মৌলভী সাহেব জানান আতরাফের সন্তানেরা তো মিয়াদের সমান চলতে পারে না।

বিশ্বকবি বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর আব্দুল্লাহ উপন্যাস পড়ে মন্তব্যে লিখেছেন আমি খুশি হয়েছি বিশেষ কারণে এই বই থেকে মুসলমানদের ঘরের কথা জানা গেল।

পদ্মা নদীর মাঝি

লেখকের নাম : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৬
সংস্করণ : বইমেলা ২০১২
প্রকাশক : বিশ্বসাহিত্য ভবন
পৃষ্ঠা : ৯৬
মূল্য : ১০০ টাকা

বাংলাসাহিত্যের উত্তর আধুনিক যুগের অন্যতম কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)। বৈজ্ঞানিক সত্যকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানিক কলম হাতে তুলে নেন। তিনি লেখায় পাশ্চাত্যরীতির সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। তার উপন্যাসগুলোতে মাকর্সীয় দর্শন ও ফ্রয়েডীয় যৌন চেতনা এ দুটি দিক স্বার্থকভাবে বিকাশ লাভ করেছে। তবে মার্কসের রাজনৈতিক শ্রেণীচেতনা ও অর্থনৈতিক চিন্তধারা এতে সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল। ফ্রয়েডের মনোসমীক্ষণ তত্ত্ব ও মার্কসীয় শ্রেণীচেতনার প্রতিফলনে রচিত 'পদ্মা নদীর মাঝি' তার বিখ্যাত উপন্যাস।

ক্ষুধা ও যৌনতা মানব জীবনের চিরন্তন দু'টি উপাদান। মানিকের গদ্যে তার প্রতিফলন খুব সঙ্গতভাবে এসেছে। পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসে পদ্মার তীর সংলগ্ন কেতুপুর গ্রাম এবং তার আশে পাশের কয়েকটি গ্রামের মাঝি ও জেলেদের বাস্তব জীবনালেখ্য যেন অংকিত হয়েছে। হত দরিদ্র পদ্মার মাঝিদের জীবন সংগ্রামই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে লেখনি দিয়ে। তাদের প্রতিটি দিন কাটে দীনহীন অসহায় আর ক্ষুধা দারিদ্রের সাথে লড়াই করে। দুবেলা দুমুঠো খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকাটাই যেন তাদের জীবনের পরম আরাধ্য। এটুকু পেলেই তারা সূখী।

পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবের। কুবের পদ্মা নদীর অসহায় দরিদ্র মাঝি। জেলেদের বেশি উপার্জন হয় ইলিশ ধরার মৌসুমে। অন্যসময় অভাব অনটনের সাথে লড়াই করে তাকে বেঁচে থাকতে হয়। গনেশ কুবেরের মাছ ধরার সঙ্গী ও একান্ত অনুগত ব্যক্তি। মূলত কুবের কে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ধরে বাকি চরিত্রগুলো চিত্রন সম্পন্ন করেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসের নায়িকা কপিলা। যদিও কুবের বিবাহিত, তার স্ত্রী আছে। তাদের সন্তান সন্ততিও আছে। তবে কুবেরের স্ত্রী মালা জন্ম থেকেই পঙ্গু। উপন্যাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হোসেন মিয়া। তার বাড়ি নোয়াখালীতে। সে এক

রসহ্যময় লোক। সে পদ্মার তীর সংলগ্ন মাঝিপ্রধান গ্রামগুলোর অসহায় মাঝিদের মাঝে প্রায় সেবকরূপে আবির্ভূত হয়। তবে আপাত দৃষ্টিতে তাকে সবার সেবক মনে হলেও এই সেবা কর্মের পেছনে রয়েছে তার এক গভীর দুরভিসন্ধি। সে বহুদুরে ময়নাদ্বীপে একটি জমিদারী পত্তন করতেছিল। সে দ্বীপ শ্বাপদসংকুল। অথচ সেই নির্জন দ্বীপেই সে একের পর এক করে পাঠাতো পদ্মা নদীর অসহায় মাঝিদের। ময়নাদ্বীপ যাওয়ার পথে নৌকার পাটাতনের নিচে হোসেন মিয়া লুকিয়ে রেখেছিল আফিম। ময়নাদ্বীপে পদ্মানদীর মাঝিদের মুখোমুখি হতে হতো অস্তিত্ব রক্ষার কঠিন সংগ্রামের। একসময় কুবেরও পাড়ি জমায় এই ময়নাদ্বীপে সাথে নেয় কপিলাকে। এভাবেই চলে অসহায় দ্বীনহীন পদ্মানদীর মাঝির জীবন। চিরকাল তারা কাটিয়ে দেয় এক অজ্ঞানতার ধোয়াশার ভেতরে। এক গোলক ধাঁধাঁয় তাদের জীবন বন্দী। এ গোলক ধাঁ ধাঁ থেকে বের হবার রাস্তা তাদের জানা নেই কিংবা কেউ সাহস করে তা থেকে বের হতেও চায়না। এভাবেই কাটে পদ্মানদীর মাঝির প্রতিটা দিন-রাত আর কেটে যায় সারাটা জীবন। সেই জীবনের গল্পই যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে উপন্যাসটির পাতায় পাতায়।

উপন্যাসটিতে জেলে জীবনের দুর্দশার সমান্তরালে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিটাও ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। দুর্দশাগ্রস্থ জেলে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি চরিত্র কুবের এবং ময়নাদ্বীপে যাওয়ার সময় কপিলাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আদিম প্রবৃত্তির তাড়ণার ইঙ্গিত। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শ্রেণীকে তুলে ধরেছেন হোসেন মিয়া চরিত্রের রূপায়নে।

পদ্মাপাড়ের মাঝিদের জীবনের ঘনিষ্ঠ বর্ণনা এবং চরিত্রের মুখের ভাষা হিসেবে এখানকারই ভাষা ব্যবহারের জন্য এ উপন্যাসকে অনেকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলেও অভিহিত করেছেন।

পুতুল নাচের ইতিকথা

লেখকের নাম : মানিক বন্দোপাধ্যায়
প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৬
সংস্করণ : ২০১৩
প্রকাশক : আফসার ব্রাদার্স
পৃষ্ঠা : ১৭০
মূল্য : ১৫০ টাকা

বাংলাসাহিত্যের উত্তর আধুনিক যুগের অন্যতম কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)। বৈজ্ঞানিক সত্যকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানিক কলম হাতে তুলে নেন। তিনি লেখায় পাশ্চাত্যরীতির সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। বাস্তবতা ও পরাবাস্তবতার এক নবতর নিরীক্ষা মানিক বন্দোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) এর উপন্যাস পুতুল নাচের ইতিকথা বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ফ্রয়েডের লিবিডো আর সমাজতন্ত্রের মন্ত্রে দীক্ষিত মানিকবাবুকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় উপন্যাসটিতে। জীবনবোধ, সমাজচেতনা ও বিজ্ঞান মনস্কতার এক পরিপূর্ণ মিথস্ক্রিয়া হচ্ছে এই উপন্যাসটি।

কলকাতার এক সাধারণ গ্রাম গাওদিয়া আর তার সাধারণ মানুষ নিয়ে এ উপন্যাসের গল্প। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শশী। সদ্য ডাক্তারি পাশ করে গ্রামে আসে বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভিন্নতর সংস্কৃতি কিংবা উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় বেরিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সে আর প্রথাগত জীবনের বাইরে যেতে পারে না। গ্রামীণ জীবনের পরিবেশ বৈচিত্রতা আর বাস্তবতার ডাল পালা এমনভাবে তাকে আকড়ে ধরে যা ছিড়ে বের হওয়া শশীবাবুদের সামর্থের বাইরে। সাধারণ মানুষগুলোর মধ্যে নিয়তি ও কার্যকারণশৃঙ্খলের টানাপোড়েন যেন উপন্যাসের প্রথম থেকেই সংকেতিত।

উপন্যাসটি আরম্ভ হয়েছে বজ্রাঘাতে নিহত পরানের বাবা হারু ঘোষের মৃতদেহের আবিস্কারের দৃশ্য দিয়ে। নায়ক শশী ডাক্তার হলেও মরাস্পর্শ অনুচিতসহ এরকম নানা কুসংস্কার তার মধ্যে ছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশ শাসনামলে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অন্তর্গত টানাপোড়েন ও অস্তিত্ব সংকট শশী চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। পরানের বউ কুসুমের সাথে ডাক্তারের সম্পর্ক। কুসুম তার কাছে আসে বৃষ্টিতে ভিজে, লোকায়ত ভাষায় অনুভব প্রকাশ করে কিন্তু শশী নিশ্চুপ থাকে। মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না।

একসময় উচ্ছল এই কুসুম সবকিছুতেই আগ্রহ হারায়। তার আত্মিক মৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে সেনদিদির সঙ্গে শশীর পিতা গোপালের সম্পর্ক, যাদব পন্ডিত ও তার স্ত্রীর ইচ্ছামৃত্যু ইত্যাদি উপন্যাসটিকে বহুচিত্রিত করেছে।

উপন্যাসের শেষ হয় টিলার উপর উঠে শশী ডাক্তারের সূর্যাস্ত দর্শনের শখের অতৃপ্ততা দিয়ে । এরই মধ্যে দশ বছরের কালপরিসরে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন চরিত্রের নিয়তির প্রতি আত্মসমর্পন, আবার যাদব পন্ডিত ও তার স্ত্রীর ইচ্ছামৃত্যু এবং কুমুদের স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে নিয়তিকে নিয়ন্ত্রণ করার মত ঘটনা।

উপন্যাসটি মানুষের মনোরহস্য ও প্রকৃতির অন্তবর্হিরহস্যের উন্মোচন ও আনোম্মাচনের আখ্যান। বাস্তবতার সমগ্রতাকে ধারণ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিত্যকার মানুষের মনের অতলান্তের নিত্য দোলাচলের রূপায়ন ঘটিয়েছেন এই উপন্যাসে শশী-কুসুম-যাদব-কুমুদ চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের স্পর্শকাতর রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে পুতুল নাচের ইতিকথা কোন একক ব্যক্তির গল্প নয়, বরং বিভিন্ন ব্যক্তির অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। সেই সাথে আদিমতা, ভন্ডামি এবং মানব মনোবিজ্ঞানের অন্ধকার উপন্যাসের একটি চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণমানুষের প্রতিনিধি যেমন তার গল্পে দীপ্যমান তেমনি মনস্তাত্বিক জটিলতা জীবনের সত্য অন্বেষণে তিনি চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন চেহারা এঁকেছেন। এক অদ্ভুদ চিত্রকরের মত মানিক জীবনকে এঁকেছেন জীবনশিল্পীর আশ্চর্য নিষ্ঠায়।

পুতুল নাচের ইতিকথায় পুতুল বলতে মূলত মানুষকেই বুঝানো হয়েছে। যারা চারিত্রিক দৃঢ়তা নিয়ে দাড়াঁতে পারে না। পুতুলের মতো অন্যের অল্প ধাক্কাতেই চালিত হয়।

আরণ্যক

লেখকের নাম	: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রথম প্রকাশ	: ১৯৩৯
সংস্করণ	: বইমেলা ২০১৪
প্রকাশক	: ইউপিএল
পৃষ্ঠা	: ৭২৮
মূল্য	: ৪০০ টাকা

প্রকৃতি বর্ণনায় অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বাংলা সাহিত্যের অমর লেখক বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)-এর সৃষ্টি আরণ্যক উপন্যাস। বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় তার বিহারে কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে উপন্যাসটি রচনা করেন। বিহারের ভাগলপুরের আজমাবাদ, লবটুলিয়া, ইসমাইলপুর, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেষ্ট হচ্ছে আরণ্যক-এর পটভূমি। এ উপন্যাস রচনার প্রাক্কালে প্রায় চার বছর তিনি পাথুরিয়িঘাটা এস্টেটের সহকারী ম্যানেজার হিসেবে চাকুরী করেন। চাকুরীর সুবাধে তিনি এ অঞ্চলের প্রকৃতি খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেন। আরণ্য পরিবেশে থাকা ফলে প্রকৃতির সাথে তার আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে তিনি রচনা করেন আরণ্যক উপন্যাস। আরণ্যক শব্দের আক্ষরিক অর্থ বনসম্বন্ধীয়। আরণ্যক উপন্যাস বটে কিন্তু তার উপাদান বিভূতিভূষণের অভিজ্ঞতা থেকে টেনে আনা, তা নি:সন্দেহে একটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্যচরন ভাগলপুর-এর কাছাকাছি জঙ্গলে একটি জমিদার এস্টেটের ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। জঙ্গলে তার জীবনের ঘটনাপঞ্জি নিয়ে উপন্যাসের কাহিনী। তার প্রাথমিক অস্বস্থি ছিল একটি শহুরে ছেলে হয়ে লোকালয় থেকে দূরে এক গভীর বনের জীবন যাপনের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া। কিন্তু ধীরে ধীরে এই বনের অপূর্ব ও জাদুময় সৌন্দর্য ও আকর্ষণশক্তিতে মুগ্ধ হতে থাকে। আদিবাসী ও স্থানীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বাড়তে থাকে। সত্যচরন তার সৌন্দর্যপূজারী সঙ্গী যুগলপ্রসাদ মিলে বনের এই সবুজ প্রকৃতিকে সাজায় নানা ধারণের দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষ লতা দিয়ে। এক সময় জমিদারের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার হাতে গড়া উদ্যান প্রজাদের মধ্যে টুকরা টুকরা করে বিলিয়ে দিতে হয়। প্রজারা বসতির জন্য এ বাগান পরিস্কার করে। তাদের কুঠারের আঘাতে ধবংস হয়ে যায় প্রাচীন

মহীরূহ, লতা বাগান ও সাজানো বৃক্ষের সিড়ি। এর জন্য অনুতাপ ও শোকের মধ্য দিয়েই শেষ হয় উপন্যাসের পরিণতি। এভাবে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে একসময় শেষ হয়ে আসে। তার চাকরীর মেয়াদ শেষ হয়। সময় হয় এখানকার মানুষের থেকে বিদায় নেওয়ার। কিন্তু এবার তার অস্বস্থি হতে থাকে শহরের দিকে যাবার ব্যাপারে। তার মন ফিরে যেতে চায় না এই আদি ও অকৃত্রিম সৌন্দর্য থেকে। বার বার এই বলেই জীবন কাটিয়ে দেয়ার ইচ্ছা হতে থাকে।

অনন্যসাধারণ এই কাহিনীতে প্রকৃতির যে অসাধারণ বিবরণ দেয়া হয়েছে তা বাংলা সাহিত্যে অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আরণ্যক উপন্যাসের কাহিনী সহজ সরল ও স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহমান। কোথাও চমক সৃষ্টির প্রয়াস নেই। একটি ধীর লয়ে বয়ে যাওয়া কাহিনী একটি শান্ত বাঁশির সুরের মতো পটভূমি অবলম্বন করে ক্রমশ পাঠককে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে সৌন্দর্যোপলব্ধির অমরাবতীতে। এ উপন্যাসে চরিত্রেরাও সরল ও মাটির কাছে বেড়ে উঠা মানুষ। প্রকৃতির সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করে এরা উৎপন্ন করে দু মুঠো চীনা ঘাসের দানা কিংবা দু মুঠো মকাই। এদের মধ্যে রয়েছে রাজু পাড়ের মত বিচিত্র মানুষ, যে একাধারে কৃষক, দার্শনিক, কবি ও চিকিৎসক। রাসবিহারী সিং ও নন্দলাল ওঝার মতো দুটি খল চরিত্র।

অনেক বিশিষ্ট সাহিত্য-রসিক সমালোচকের মতে আরণ্যক উপন্যসটি বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য সৃষ্টি। ভারতের সাহিত্য একাডেমী এ উপন্যাসকে বাংলাভাষায় রচিত দশটি শ্রেষ্ঠগ্রন্থের মধ্যে স্থান দিয়েছে।

কবি

লেখকের নাম	: তারাশঙ্কর বন্দোপধ্যায়
প্রথম প্রকাশ	: ১৯৪১
সংস্করণ	: বইমেলা ২০১৩
প্রকাশক	: বিশ্ব সাহিত্য ভবন
পৃষ্ঠা	: ১৪৪
মূল্য	: ১৮০ টাকা

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাঙলা কথা সাহিত্যের এক প্রাত:স্বরণীয় নাম। তার একাধিক উপন্যাসে নিম্নবর্গের জীবন ও চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। রাঢ় ও বাংলার কৃষক, কুলি-কামিন, কাহার, বাগধি, ডোম, বাউরি, চণ্ডাল প্রভৃতি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তার উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। লেখক বর্ণগত শ্রেণীবৈষম্যের পাশাপাশি নানা অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে নিম্নবর্গের জীবনের অস্তিত্ব সংকট, রাজনৈতিক বাস্তবতা, সামাজিক আন্তক্রিয়া, নরনারীর সম্পর্ক বিশ্লেষণে বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এরূপ একটি উপন্যাস 'কবি'। উপন্যাসটি ডোম সম্প্রদায়ের একজন যুবকের কবিরূপে প্রতিষ্ঠা এবং দুটি নারীর সঙ্গে তার সম্পর্কের কাহিনী নিয়ে রচিত।

হিন্দু শ্রেণী ব্যবস্থায় সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ডোম। অট্টহাস গ্রামের এমনই এক ডোম পরিবারে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে উঠে নিতাই। পিতা ও পিতামহের পেশা ছিল চুরি ডাকাতি। কিন্তু তার স্বভাব পূর্বপুরুষদের মত নয়। সে সৎ থাকতে চায়। যখনই তাকে পারিবারিক পেশা গ্রহণের জন্য চাপ আসল তখন সে ঘর বাড়ি ছেড়ে সে স্টেশনে থাকে। এখানে তার সাথে বন্ধুত্ব হয় স্টেশনের পয়েন্টসম্যান রাজালালের সাথে। নিতাই কবিয়াল ধরনের মানুষ। একদিন ঘটনাক্রমে গ্রামের মেলায় কবি আসরে সুযোগ পেয়ে নাম কামিয়ে ফেলে। তার এ খ্যাতি বিভিন্ন দিকে ছড়াতে থাকে। সে গান বাঁধে, শুনিয়ে বেড়ায় হাটে বাজারে মেলায়। এর মাঝেই কবিয়ালের জীবনে প্রেম আসে। তাকে উচ্ছসিত করে। তার গান, কবিতা নতুন করে উজ্জীবিত হতে থাকে। প্রেমিকা তার বন্ধু রাজার বিধবা শ্যালিকা। যাকে সে ঠাকুরঝি বলে ডাকত। ঠাকুরঝি প্রতিদিন দুধ বিক্রি করার জন্য আসত। ঠাকুরঝিও নিতাইকে ভালবেসে ফেলে। ঘটনার টানাপোড়েন এ এই প্রেম চেপে থাকে না। মানুষ জেনে যায়। জানাজানি হলে নিতাই গ্রাম ছেড়ে চলে যায়।

অন্যত্র গিয়ে সে এক ঝুমুর দলে ঢোল বাজানোর কাজ পায়। যেই দল দিনে গান গেয়ে নেচে, রাতে দেহ বেঁচে জীবন চালাতো। সে ক্রমশ তার নিজের কবিয়াল সত্তাকে চাপিয়ে রেখে ঐ দলের মত করে গান রচনা করে। এখানেও সে বেশ জনপ্রিয় হয়। সেখানে পরিচয় হয় সেই দলের সবচেয়ে ধারালো, চৌকশ ও রূপপোজীবী বসন্তের সাথে। বসন্ত-এর মধ্যে সে ঠাকুরঝির ছায়া সে দেখতে পায়। দুজনের মধ্যে সখ্যতা গড়ে উঠে। প্রতিজ্ঞা করে মরণের আগে কেউ কাউকে ছেড়ে যাবে না। রুপোপজীবী ব্যবসায় থাকলে নানা ধরনের রোগ হয়ে থাকে। বসন্তের রক্তব্যামো বেড়ে যায়, এক সময় নিতাইয়ের কোলে মাথা রেখে বসন্ত মারা যায়। কাউকে না পেয়ে কবি একাই লাশ দাহ করে। কিন্তু পাপিকে আগুন ছোঁয়ানো ছিল মস্ত বড় পাপ। সবাই কবিকে বলে, তুমি এটা কি করলে? ভগবান যখন প্রশ্ন করবেন তখন কি জবাব দেবে তুমি? কবি বলেছিল কোন জবাব দিব না, মাথাটা নিচু করে দাড়িঁয়ে থাকবো। শোকে কাতর হয়ে ঝুমুরদল ছেড়ে দেয় নিতাই।

এরপর সে কাশীসহ অন্যান্য স্থানে ঘুরে বেড়ায়। কোথাও স্থির হতে না পেরে সে আবার গ্রামে ফিরে আসে। এসে জানতে পারে ঠাকুরঝিও মারা গেছে। নিতাই গ্রাম ছাড়ার পরপরই সে মারা যায়। এভাবে উপন্যাসে বিভিন্ন প্রকার গানের পাশাপাশি ভিন্ন ধারণার জীবনযাত্রার আবহে একটি অন্যরকম প্রেমের কাহিনী রচিত হয়েছে।

আখ্যানের নিপুণ বিন্যাস, চরিত্রগুলোর উজ্জ্বল উপস্থিতি এবং গানের সহজ কথার সঙ্গে জড়িত সংলাগ ও বেদনা সব মিলিয়ে উপন্যাসটি তারাশঙ্করের শেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসের ক্লাসিক সংলাপটি হলো- "এই খেদ আমার মনে, ভালবেসে মিটলোনা সাধ কুলালোনা এই জীবনে। হায়! জীবন এতো ছোট কেনে? এই ভূবনে।"

রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কবি। এক কূলবধু আর এক বারাঙ্গনা- এই দুই ভিন্নস্বভাবা নারী যেন বাহ্যিক পরিচয়কে ছাপিয়ে নিতাইয়ের কবি মানসে চিরন্তন নারী, চিরন্তন প্রেমিকার আসনে বসে তাকে কবিপদে অভিসিক্ত করেছে আর সেই সাথে কবি উপন্যাসকে দিয়েছে ক্লাসিকের মর্যাদা।

নদী ও নারী

লেখকের নাম : হুমায়ুন কবির
প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৫
সংস্করণ : ২০১৩
প্রকাশক : শোভা প্রকাশ
পৃষ্ঠা : ১৯২
মূল্য : ২৫০ টাকা-

হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯) ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, লেখক ও দার্শনিক। এ সকল ক্ষেত্রেই তার ছিল সফল পদচারণা। এক আকর্ষণীয় ভাষাভঙ্গী আয়ত্তের মাধ্যমে লেখালেখীর জগতে তিনি অবস্থান করে নেন। তার কথাসাহিত্যের পরিসর সংক্ষিপ্ত হলেও এক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অনুশীলনব্রতী। তার রচিত নদী ও নারী (১৯৪৫) একটি হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস।

এ উপন্যসের পটভূমিতে রয়েছে গ্রাম। চরের মানুষের জীবনালেখ্য মূর্ত হয়ে উঠেছে উপন্যাসের পরতে পরতে। পল্লী মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, হিংসা-বিদ্বেষ উপন্যাসের চরিত্রগুলোতে সাবলীল হয়ে ধরা পড়েছে। বন্ধুত্বের গভীরতা যেমন প্রাণে দোলা জাগায়, তেমনি হিংসা পরায়ণতা মনকে বিষাদময় করে তোলে। একদিকে সংস্কার অন্যদিকে বাঁচার তাগিদ, একদিকে প্রেম অন্যদিকে বিদ্বেষ, সমাজের ঘটনাবহুল জীবন উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে তুলেছে প্রাণবন্ত। নজু মিয়া আর আসগর মিয়া দুই বন্ধু। তাদের জীবনের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আর্বতিত হয়েছে 'নদী ও নারী' উপন্যাসের কাহিনী। আমিনাকে বিয়ে করা নিয়ে দুই বন্ধুর শত্রুতা, মালেক নুরুর বিয়ের প্রতিবন্ধকতা কাহিনীকে দিয়েছে নাটকীয়তা। 'নদী ও নারী' উপন্যাসটিকে অনায়াসে চরের মানুষের জীবন্ত জীবনালেখ্য বলে আখ্যায়িত করা যায়।

নদী তীরবর্তী মানুষের জীবন কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়ে- নদীর সঙ্গে যেমন বাংলাদেশের মানুষের সমপর্ক আবহমান কালের, নারীর ছাড়াও মানুষের জীবন তেমনি অসম্পূর্ণ- লেখক এ সত্যই প্রকাশ করেছেন। নদী এক পাড় ভাঙে অন্য পাড় গড়ে, ধারা বদল করে নতুন খাদ সন্ধান করে। তবে পুরনো খাদ ভোলেনা, বারবার ফিরে আসে। নদীর এই ভাঙা-গড়া খাদ বদল মানুষের জীবনেও রয়েছে। বাঙ্গালী নারীর জীবনে তা আরও বেশি করে আছে। পুরোনোকে ছেড়ে সে নতুন সংসারে যায়, তবে পুরোনো শিকড়ের কাছে

বারবার ফিরে আসে গভীর মমতায়। এভাবে হুমায়ুন কবির নদী ও নারীর মধ্যকার সম্পর্কের ভিন্ন মাত্রা সৃষ্টি করেছেন।
নদী ও নারী উপন্যাসটির কাহিনী সংক্ষিপ্ত আকারে সহজ ও সরল ভাষায় পরিবেশন করা হয়েছে। আকারে সংক্ষিপ্ত হলেও কাহিনীর কোথাও ছন্দপতন ঘটেনি। ফলে উপন্যাসটি সবার জন্যেই পাঠের উপযোগী ও হৃয়দগ্রাহী হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা

লেখকের নাম : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৭
সংস্করণ : ১ম, ২০১৪
প্রকাশক : দি স্কাই পাবলিশার্স
পৃষ্ঠা : ৪৩৮
মূল্য : ৩৫০

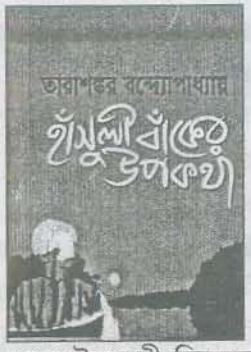

বাংলা কথাসাহিত্যধারায় বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের বিংশ শতকের উত্তরসুরী হিসেবে সর্বাগ্রে আসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) নাম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্মীয় শিক্ষার অবাধ অনুশীলন ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব- এই দুইয়ের মিথষ্ক্রিয়ায় তরাশঙ্করের মানস গঠিত হয়েছিল। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' তারাশঙ্করের অনন্য উপন্যাস। এই উপন্যাসের সূত্রে আমরা বাংলা উপন্যাসের আলাদা মানচিত্রে, আলাদা ভুগোলে প্রবেশ করি। এই উপন্যাসে উঠে এসেছে লোকায়িত জগতের অতলে লুকিয়ে থাকা এক আদিম সমাজচিত্র। উপন্যাসে বীরভূমের কাহার বাউরী সম্প্রদায়ের জীবন, তাদের সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস, আচার-আচরণ, লোককতা আন্তরিকতার সাথে তুলে ধরা হয়েছে।
কোপাই নদীর বৃত্তাকার ধরনের বাক নারীর গলার অলংকার হাঁসুলীর অনরূপ। এই বাকে বাঁশ-বেতের গভীর জঙ্গল। সূর্যের আলো সেখানে পৌছায় না। এই জঙ্গলে বসবাস কাহারদের (পালকী বাহক)। লৌকিক দেবতার নির্দেশে কাহারদের সমাজ পরিচালিত হয়। তাদের সকল আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় কুসংস্কার লোকবিশ্বাস রীতি-প্রথার মত কঠোর অনুশাসন দ্বারা। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়

সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই রাঢ় অঞ্চলের অন্ত্যজ সমাজের ছবি অঙ্কন করেছেন।
উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র বনোয়ারী, করালি। কুসংস্কারাচ্ছন্ন কাহার সম্প্রদায়ের নিকট সাপ হল দেবতা। করালি একটি সাপ মেরে ফেললে মোড়ল বনোয়ারি পুরো সম্প্রদায়কে দেবতা হত্যার পাপে পাপী মনে করে। এ থেকে করালী বনোয়ারির দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এভাবে করালী তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন নানা আচারের অন্যথা করতে থাকে। করালী গোষ্ঠীর নিয়মের তোয়াক্কা না করে বনোয়ারির নিষেধ সত্ত্বেও রেলষ্টেশনে কুলির কাজ করে নগদ অর্থ উপার্জন শুরু করে এবং একসময় সে শহরে গিয়ে বসবাস শুরু করে। করালীর প্রেমে সারা দিয়ে অসুস্থ্য স্বামীকে ফেলে রূপবতী যুবতী পাখীও করালীর সাথে শহরে যায়। করালীকে অনুসরণ করে যুবক সম্প্রদায়ের অনেকেই শহরে যেতে থাকে। ব্যর্থ হতে থাকে বনোয়ারী। এ উপন্যাসে রয়েছে দুটি সমান্তরাল কাহিনী স্রোত। একটি বাঁশবাদি গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কোপাই নদীর বিখ্যাত হাঁসুলি বাঁকের কাহার সম্প্রদায়ের জীবন সংহতির অনিবার্য ভাঙন, কৃষি নির্ভর জীবনের ক্রমবশান এবং বাঁশ-বন ঘেরা উপকথার হাঁসুলি বাঁকের বিরান প্রান্তরে পরিণত হওয়ার কাহিনী। ঔপন্যাসিক দেখাতে চেয়েছেন হাঁসুলি বাঁকের গোষ্ঠী জীবনের বিনাশের ইতিহাস অর্থাৎ মূল্যবোধের বিপর্যয়ের ফলে স্বগ্রাম থেকে উচ্ছেদের কাহিনী। তবে উপন্যাসের শেষে করালীকে হাঁসুলি বাঁকে ফিরিয়ে এনে এ বাঁককে সরব রেখেছেন।
এ উপন্যাসে সাপ আর নদী দুটি প্রতীক। একটি হলো যুগযুগ ধরে জমে থাকা কাহারদের ভিতর ও বাইরের জীবনের অন্ধকারের গতির প্রতীক। আরেকটি হলো এ অচলতার মাঝে গতির প্রতীক।
অন্যদিকে এই সম্প্রদায়ের আত্মবিরোধ, পরিবর্তন ও বিলুপ্তি যেমন কাহিনীর প্রধান ধারা আর একটি ধারা হল প্রাচীন সমাজের সঙ্গে নতুন পরিবর্তমান জগতের সংঘাত। সেই সঙ্গে আছে এক আদিম মানবিক সংরাগ।

লালসালু

লেখকের নাম	: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
প্রথম প্রকাশ	: ১৯৪৮
সংস্করণ	: বইমেলা ২০১৫
প্রকাশক	: অ্যাডর্ণ পাবলিকেশন
পৃষ্ঠা	: ১২০
মূল্য	: ১৭০ টাকা

বিংশ শতাব্দীর বাংলা কথাসাহিত্যের ভিন্নমাত্রিক রূপকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭৪)। তাঁর রচনাসমূহ গভীর জীবনবোধ, অন্তর্লোকের রহস্য উন্মোচন স্পৃহা, সংস্কারমুক্ত ও স্পষ্টবাদী উচ্চারণে সমৃদ্ধ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহুমাত্রিক জীবনাচরণের অভিজ্ঞতা থাকার ফলে অস্তিত্ববাদ, অভিব্যক্তিবাদ, মনোবিকলন তত্ত্ব প্রভৃতি তিনি আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। ফলে তাঁর সাহিত্য হয়ে উঠেছে বৈশ্বিক জীবনমথিত অভিজ্ঞান। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ধার্মিক ছিলেন, ধর্মান্ধ ছিলেন না। ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর 'লালসালু' উপন্যাস।

লালসালু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর একটি বিখ্যাত উপন্যাস। গ্রামীণ সমাজের সাধারণ মানুষের সরলতাকে কেন্দ্র করে ধর্মকে ব্যবসার উপাদানরূপে ব্যবহারের একটি নগ্ন চিত্র উপন্যাসটির মূল বিষয়। উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায় প্রত্যন্ত এক গ্রামে এসে উপস্থিত হয় মজিদ নামের এক মোল্লা। এই মজিদই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। অর্থকষ্ট ও অনাহারের হাত থেকে বাঁচতে এবং অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে নিজ গ্রাম ছেড়ে সে এই গ্রামে আসে। এসেই এক অদ্ভুত কাজ করে। গ্রামের এক প্রান্তে অবস্থিত ঝোপ ঝাড় পরিস্কার করে একটি ভাঙ্গা কবরকে ঘোষণা দেয় এটা এক প্রখ্যাত পীরের কবর। কবরটিকে এক টুকরা লাল কাপড় দিয়ে সে ঢেকে দেয় এবং ধীরে ধীরে সেখানে একটি মাজার প্রতিষ্ঠা করে। লাল কাপড়ে ঢাকা সেই কবরকে ঘিরে গ্রামের মানুষের উৎসাহ বেড়ে যায়। মজিদ এমনভাবে প্রচারণা চালায় যাতে গ্রামবাসীর মনে এই কবরকে এতদিন অবহেলার কারণে অপরাধবোধ জাগ্রত হয়। এভাবেই মজিদ সেই গ্রামে বসতি স্থাপন করে। এরপর মজিদ এই গ্রামেই বিয়ে করে। তার স্ত্রীর নাম রহিমা। স্ত্রীকে নিয়ে সে সম্মানের সাথে বসবাস করছিল। তার স্ত্রী কৃষক ঘরের মেয়ে। কর্মঠ, পরিশ্রমী কিন্তু দেখতে তেমন আকর্ষণীয় নয়। গ্রামের মানুষের কল্যাণে তার আর্থিক স্বচ্ছলতাও এসেছে। তার ক্ষমতা, প্রভাব

ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলে সে দ্বিতীয় বিয়ে করে। নতুন বউ এক কিশোরী মেয়ে নাম জমিলা। সে এমনিতে সহজ-সরল কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে এক ধরনের চঞ্চলতা। প্রথম থেকেই মজিদকে সে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে পারে না। সে যেন কিছুকেই ভয় পায় না। মাজারের প্রতি তার তেমন শ্রদ্ধা ভক্তি নেই। এতে বিচলিত হয়ে উঠে মজিদ। তার অস্তিত্ব যেন সংকটে পরে। নতুন বউকে শাসন করতে গিয়ে কঠোর হয়ে উঠে মজিদ কিন্তু পারে না। জমিলাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য মাজার ঘরে বেঁধে রাখে। কিন্তু জমিলা মাজারকে ভয় না পেয়ে অগ্রাহ্য করে। এদিকে ঝড় শুরু হলে মজিদ গিয়ে দেখে জমিলা মেঝেতে পরে আছে, তার বুক উন্মুক্ত এবং মেহেদি রাঙানো একটি পা কবরের সাথে লাগানো।

ওয়ালীউল্লাহ উপন্যাসে নানা পরিচর্যারীতির সচেতন ব্যবহার করেছেন। যেমন কবরের আচ্ছাদন হিসেবে মজিদ লাল রঙ ব্যবহার করেছে, যাতে লাল রঙের ঔজ্জ্বল্য সহজে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর এ থেকেই লেখক উপন্যাসেরও নামকরণ করেছেন 'লালসালু'। উপন্যাসে দেখিয়েছেন গ্রামের মানুষের কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাসকে পুঁজি করে অসাধু ব্যক্তিরা কীভাবে সুবিধা নেয় এবং এই কুসংস্কার ও পীর প্রথায় প্রচণ্ড আঘাত হানেন মাজারের কবরে জমিলার পা লাগিয়ে। এসবের পাশাপাশি উঠে এসেছে ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব সংকট ও টিকে থাকার সংগ্রাম। সবকিছু মিলিয়ে লালসালু একটি অসাধারণ উপন্যাস।

কাশবনের কন্যা

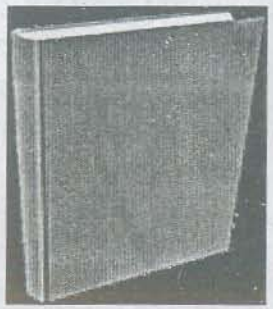

লেখকের নাম : শামসুদ্দীন আবুল কালাম
প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৪
সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৪
প্রকাশক : বিভাস
পৃষ্ঠা : ১৬০
মূল্য : ২৫০ টাকা

কাশবনের কন্যা শামসুদ্দিন আবুল কালামের (১৯২৬-১৯৯৭) সবচেয়ে বিখ্যাত ও মিথিক্যাল উপন্যাস। আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ট সাধারণ লোকের অভিভূত জীবনযাপনের গল্প নিয়ে ভিন্ন ধরনের চমৎকার বর্ণনাসমৃদ্ধ একটি উপন্যাস। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত এ উপন্যাসের প্রচ্ছদশিল্পী ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন।

নিজের অজ্ঞাতে প্রতিদিনকার জটিলতায় নিক্ষিপ্ত সমাজের মানুষের গল্প এবং মানুষের বিশ্বাসপূর্ণ আশা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার গল্পের নিখুঁতচিত্র একটি বিস্তৃত পরিসরে তিনি অঙ্কন করেছেন। নদীতে জেগে উঠা চর, মাছধরার গল্প, গ্রামীণসঙ্গীত, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু:খসহ ভালোবাসা এবং বিরামহীন বেদনা এই বইয়ে জীবন্ত। তাদের জীবনের আন্তরিক সুখবোধ তাদের গভীর থেকে প্রকাশিত এবং এ উপন্যাসে বিস্তারিতভাবে বিবৃত। প্রকৃতির খেয়ালী বৈশিষ্ট্যের নিষ্ঠুরতাকে কীভাবে মানুষ প্রকৃতি এবং প্রতিদিনের স্বাভাবিক অভ্যাসে মিশ্রিত করে মোকাবেলা করে তা এখানে উপস্থাপিত।

সুচারু বাংলায় লেখা উপন্যাসটি বহু আঞ্চলিক উপভাষা ধারণ করে আছে। মধ্যযুগীয় কাব্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপখ্যানের সুরের সঙ্গে গ্রামীণ লোকজনের জীবন এই বইটিকে চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের আঁকা শোভণ প্রচ্ছদেই বইয়ের বিষয়বস্তু আগে থেকেই উপস্থাপিত। কাজেই যাকে বলা যায়, সমাজের উগ্র কঠোরতা এবং প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা এসকল মানুষের জীবনকে যে নির্দয়ভাবে অত্যাচারে জর্জরিত করেছে তারই বেদনার্ত জীবনালেখ্য।

বইয়ে জমি, মানুষ এবং প্রকৃতির সমান্তরাল চিত্র অঙ্গিত হয়েছে। বাইরে থেকে চোখ ঝলসানো জীবনের আমাদের শহুরে জীবন-যাপনের মধ্যে ঐসব মানুষের অন্তর্গত জীবনকে জেনে এদেশে বসবাসরত মানুষের জীবনকে জানা। বইটি যেন তাদের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি।

কাশবনের কন্যা উপন্যাসটি জনপ্রিয়তার কারণে এটি অনেকবার মুদ্রিত হয়েছে। প্রথম প্রকাশের মাত্র দুই বছরের মধ্যেই দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করতে হয়। বইয়ে শহর থেকে গ্রামে এবং গ্রাম থেকে শহরে, কাজ থেকে কাজে, জীবন থেকে জীবনে মানুষের উন্মুলতা ও অভিবাসন দক্ষ তুলির আঁচরে চিত্রিত। মাটির ও মানুষের জীবনসংগ্রামের সার্থক রোমাঞ্চকর উপাখ্যান এই উপন্যাসটি। এতে একটি কাহিনীর অন্তরালে রয়েছে মূল কাহিনী ও উদ্দেশ্য, সাধারণ মানুষের সমৃদ্ধ উৎকৃষ্ট হৃদ্য করে চলা অন্তহীন সংগ্রামই এর মৌলিক উদ্দেশ্য এবং গল্প। এটি একটি চিরন্তন গ্রন্থ।

সূর্য দীঘল বাড়ি

লেখকের নাম : আবু ইসহাক
প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৫
সংস্করণ : ২০১৩
প্রকাশক : নওরোজ সাহিত্য সম্ভার
পৃষ্ঠা : ১১০
মূল্য : ৯০ টাকা

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০২)। স্বল্প পরিসরে হলেও কথাসাহিত্যের প্রায় সব শাখায় তিনি বিচরণ করেছেন। তার রচনার পটভূমি হিসেবে এসেছে বিশ শতকের মানুষের জীবনের আত্মিক, মানবিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময়কে কেন্দ্র করে রচিত আবু ইসহাকের বিখ্যাত উপন্যাস 'সূর্য দীঘল বাড়ী'।

উপন্যাসের প্রেক্ষিত কালে অর্থাৎ ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে অবিভক্ত ভারতের বাংলায় ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে পঞ্চাশের আকাল নামে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তাতে বহু লক্ষ দরিদ্র মানুষ প্রাণ হারায়। যারা কোন মতে শহরের লঙ্গরখানায় পাত পেতে বাঁচতে পেরেছিল তাদের একজন স্বামী পরিত্যাক্ত জয়গুন। এই জয়গুনকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। কাহিনী শুরু হয়েছে এভাবে- জয়গুন মৃত প্রথম স্বামীর ঘরের প্রথম

ছেলে হাসু ও দ্বিতীয় স্বামীর ঘরের মেয়ে মায়মুনা এবং মৃত ভাইয়ের স্ত্রী-পুত্র সাথে নিয়ে শহর থেকে নিজের গ্রামে ফিরে আসে। এসে এমন এক খণ্ড জমিতে ঘর তৈরি করে যা অপয়া ভিটে বলে পরিচিত ছিল। সেখানে রাতে ঘরে কথিত ভুতের টিল পড়ে, নির্ভয়ে থাকা যায় না। কেউ থাকতে পারেনি। তাই সূর্য দীঘল বাড়ি অমঙ্গলের প্রতীক হয়। সেই বাড়িতে থেকে তারা যখন জীবনযুদ্ধে প্রাণপন লড়ছে। তখন জয়গুনের দিকে গাঁয়ের মোড়লের কুদৃষ্টি পড়ে, ঘরে বউ থাকা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করতে চায়। এক সময় দ্বিতীয় স্বামীও তাকে ঘরে তুলতে চায়। কিন্তু কারো প্রস্তাবে সে রাজি হয় না। এ ব্যাপারে মোড়ল ও দ্বিতীয় স্বামী প্রতিযোগী হয়ে উঠে। উপন্যাসের শেষের দিকে জয়গুনের দ্বিতীয় স্বামী এক রাতে দেখে ফেলে রাতে ভুত হয়ে বাড়ীতে টিল ছোড়া মোড়লের কারসাঁজি। সেই রাতের আঁধারেই মোড়ল তাকে হত্যা করে এবং দিনের আলোতে প্রচার করে এ হত্যাকাণ্ড ভুতেরই কাজ। ঘটনার একমাত্র দর্শক হিসেবে জয়গুনকেও মূল্য দিতে হয় ভিটে ও গ্রাম ছাড়া হয়ে। জয়গুন, হাসু, মায়মুনা, শফি, ডা.রমেশ চক্রবর্তী প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের দারিদ্র্য, কুসংস্কার, মোড়ল মোল্লাদের দৌড়াত্ম, বৌয়ের উপর হৃদয়হীন শাশুড়ির অত্যাচার ইত্যাদির ঘনিষ্ঠ পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

সবমিলিয়ে গ্রামীণ মুসলমান জীবনের যে ঘনিষ্ঠ এবং আন্তরিক পরিচয় এতে দেওয়া হয়েছে সমকালীন বাংলা সাহিত্যে তা বিরল।

উপন্যাসটি প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ সমাজের বাস্তব চিত্র। সেই সাথে উপন্যাসটিতে চিত্রিত হয়েছে পঞ্চাশের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ বিভাগ, স্বাধীনতার প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জীবন সংগ্রামের ভয়াল রূপ। এর কাহিনীর বিচিত্রতার মধ্যে মূল বিষয় একটিই তা হচ্ছে কুসংস্কার, সম্পদ, ধর্ম, প্রতিপত্তি, সামাজিক বাধা-নিষেধ এমনকি জাতীয়তাবোধ- এ সবকিছুকে কাজে লাগিয়ে শ্রমজীবি ক্ষুধার্থ মানুষকে ক্রমাগত শোষণ প্রক্রিয়া।

ঔপন্যাসিক অসামান্য দক্ষতার সাথে গঠনশৈলী ও ভাষাভঙ্গির সহজ ব্যবহারে সামাজিক, গ্রামীণ ও জাতীয় সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সরল ও স্বতস্ফূর্তভাবে তুলে ধরেছেন। ফলে এটি বহুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

তিতাস একটি নদীর নাম

লেখকের নাম : অদ্বৈত মল্লবর্মণ
প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৬
সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি, ২০০৯
প্রকাশক : বর্ণবিচিত্রা
পৃষ্ঠা : ২০৮
মূল্য : ১৮০ টাকা

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের এক অকালপ্রয়াত শিল্পী অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১)। ১৯১৪ সালের ১ জানুয়ারী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নাছিরনগর উপজেলার তিতাস নদীর তীরবর্তী গোকর্ণ গ্রামের এক জেলে পাড়ার মালো পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শিকড় সন্ধানী এ শিল্পী নদী ও নদী তীরবর্তী জেলে সম্প্রদায় নিয়ে রচনা করেন 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস। খুব বেশি উপন্যাস তিনি রচনা করতে পারেন নি, তবে এই একটিমাত্র উপন্যাসের জন্যই তিনি অমর হয়ে আছেন। নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাসসমূহের মধ্যে এটি গুরুত্বপূর্ণ।

গোকর্ণঘাটের তিতাস নদীর তীরবর্তী অঞ্চল যেখানে তিনি জন্মেছিলেন সেই মালোপাড়াই তার উপন্যাসের পটভূমি। এতে জেলে ও মৎসজীবী সমাজের দুঃখ-দুর্দশা, রীতি নীতি, ধর্ম-সংস্কার, উৎসব ও জীবন যাপনের অনবদ্য কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র কোন মানুষ নয় একটি 'নদী', নাম তিতাস। তিতাসের দু'পারের মৎসজীবিদের জীবন নিয়েই এ উপন্যাসে আলোচানা করা হয়েছে। মাছ ধরা নৌকা বেয়ে তাদের জীবন অতিবাহিত হয়। জীবিকার জন্য তারা পরিশ্রম করলেও প্রাচুর্যের মুখ কখনোই দেখে না। অভাব তাদের নিত্য সঙ্গী। এ উপন্যাসে কিশোর, সুবল, অনন্ত, তিলক, বাসন্তী ও বনমালী প্রমূখ চরিত্রের মাধ্যমে লেখক সেই দৈন্য পীড়িত কাহিনীর রূপ দিয়েছেন। সমাজের ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তনের সে ঢেউ কীভাবে জেলে পাড়ায় এসে লাগে তা জেলেদের জবান বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। লেখক দেখিয়েছেন প্রকৃতির খেয়ালে একদিন তিতাসের ধারা কিভাবে শুকিয়ে যায়, সেই সাথে অনিবার্যভাবে শীর্ণ হয়ে আসে ধীবর সম্প্রদায়ের জীবন।

মালো সমাজের অভ্যন্তরীন মানুষের আবিস্কার, পরিবেশগত ঘনিষ্টতা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের নানামাত্রিক রূপায়ণ ঘটেছে এ উপন্যাসে।

মানুষের জীবন ও জীবিকার সীমাহীন সংগ্রাম, দুষ্ট খল সমাজ জীবনের ঘূর্ণিপাকে মানবিকতার বিরাট পরাজয়ও সেখানে বৃহত্তর ব্যাপ্তি লাভ করেছে। অদ্বৈত মল্লবর্মণ দেখিয়েছেন- মানুষের জীবনের বিপুল সম্ভাবনা থাকলেও অমোঘ প্রকৃতি ও প্রবাহমান কালের সত্য তার ট্রাজিক জীবনের মূল। এই ট্রাজেডি আবার ব্যক্তি মানুষের নয়, সমগ্র সমাজব্যাপী এক নিরুচ্চার সত্যের প্রতিনিধিত্ব করে সে ক্রমশ ব্যক্তিমানুষেরই বেদনায় অভিষিক্ত। অবশ্য ব্যক্তিজীবনের বোধ এ উপন্যাসে থাকলেও তা ব্যক্তিসর্বস্ব হয়ে উঠে নি। নিম্নজীবি মানুষের কণ্ঠস্বরকে বাহ্যিক অর্থে নয় বরং অভিজ্ঞতার আলোকে শিল্প রচনার এর অনুভবী বাস্তবতার নাম 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ মালো সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সুগভীর অন্তঃদৃষ্টির কারণেই উপন্যাসটি মালো তথা ধীবর সমাজের নিষ্ঠুর জীবন সংগ্রামের সাধারণ কাহিনী হয়ে উঠেছে অবিনশ্বর ও অসাধারণ। এ উপন্যাসটি প্রথমে মাসিক পত্রিকা মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েকটি অধ্যায় প্রকাশিত হওয়ার পর মূল পাণ্ডুলিপিটি রাস্তায় হারিয়ে যায়। পরে বন্ধু বান্ধব ও অতি আগ্রহী পাঠকদের আন্তরিক অনুরোধে তিনি পুনরায় কাহিনীটি লেখেন। কাঁচড়াপাড়া যক্ষা হাসপাতালে যাওয়ার আগে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বন্ধু-বান্ধবকে দিয়ে যান। অদ্বৈত মারা যাবার কয়েক বছর পর 'তিতাস একটি নদীর নাম' শিরোনামে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতা থেকে রচিত এ উপন্যাস জেলে সম্প্রদায়ের জীবনের ঘনিষ্ঠ বর্ণনা সমৃদ্ধ। লেখক অত্যন্ত দরদের সাথে দক্ষ লেখনীর মাধ্যমে তাদের জীবনের কথা তুলে ধরেছেন সুশীল সমাজের কাছে। যা আজও জেলে জীবনের বিশ্বস্ত দলিল হিসেবে বিবেচিত এবং নদীমাতৃক দেশের সাহিত্যের নদী সম্পর্কিত উপন্যাস ধারা পেয়েছে পূর্ণতা।

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র

লেখকের নাম : আলাউদ্দিন আল আজাদ
প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০
সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি, ২০১০
প্রকাশক : গতিধারা
পৃষ্ঠা : ৮৪
মূল্য : ৭০ টাকা

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের শুরুর দিককার খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯)। মননশীল রচনা ও কাহিনীমূলক গদ্যবয়ানের মধ্য দিয়ে তাঁর লেখালেখি শুরু। তিনি লেখায় আশাবাদী সংগ্রামী মনোভাব এবং নাগরিক জীবনের বিকার উপস্থাপনে ছিলেন আগ্রহী। তার প্রথম উপন্যাস 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র'(১৯৬০)। প্রথম হলেও এ উপন্যাসেই তাঁর লেখক সত্তা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬০ সালে 'পদক্ষেপ' নামক পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। একজন শিল্পীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ উপন্যাসের কাহিনী।

জাহিদ সেই শিল্পী যার শিল্পী হয়ে উঠার গল্পই 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' উপন্যাস। কেন্দ্রীয় চরিত্র চিত্রশিল্পী জাহেদের চিত্র 'মাদার আর্থ' করাচিতে এক আর্ন্তজাতিক একজিবিশনে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। এ খবর দিয়ে উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছদের শুরু হয়েছে। সেই ছবিটা আকার পেছনের গল্পই উপন্যাসের মূল কাহিনী। শিল্পী মানুষ তার গল্পটাও তো হবে শৈল্পিক। পেছনের গল্পটা আগাগোড়া রোমান্সে মোড়ানো একটা স্মৃতিচারণ। সেই স্মৃতিচারণে আছে বন্ধুত্ব-প্রেম, আছে সমাজের ভয়াল দর্শন।

এর কাহিনী এরূপ- জাহেদ আরেক চিত্রশিল্পী জামিলের বাসায় ছবি আঁকার সূত্রধরে যাতায়াত করে। আর এ যাতায়াতের সূত্রে জামিলের ছোটবোন 'ছবি'র সঙ্গে জাহেদের প্রেম ও প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠে। এ বিষয়টি জামিল ভালভাবে নেয় নি। অবশ্য এর কারণও ছিল। জাহিদ ছবির অতীত জীবনের অন্ধকার দিকটা জানে না। জানা সম্ভবও নয়। অন্যদিকে জামিলের স্ত্রী মীরার মধ্যস্থতায় ছবি ও জাহেদের বিয়ে হয়। তাদের সংসার জীবনের শুরুতেই ঘটে যায় এক বড় ধরনের বিপত্তি। এক রাতে জাহেদ ছবির শরীরে বিবাহপূর্ব সন্তান উৎপাদনের চিহ্ন উদ্ধার করে। ঘটনার বিবরণে জানতে পারে জামিলের এক

পরিচিত দুর্বৃত্তের দ্বারা ছবি ধর্ষিত হয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল। সে সন্তানটি নষ্টও করা হয়েছিল। বিবাহিত জীবনে ছবি আবার অন্তঃসত্ত্ব হয়। জাহিদ কি তাকে গ্রহণ করবে? জাহেদ সহশিল্পী মতলুবের দৃশ্য মনে করে- সন্তান মারা যাবার পর মতলুব উন্মাদের মত হয়ে গিয়েছিল। এ কথা মনে করে জাহেদ সিদ্ধান্ত নেয় জীবন কিংবা ভ্রুণের বিনষ্টি নয়, জীবনকে গড়তে হবে। ভাঙা নয়, গড়ার মধ্যেই প্রকৃত সুখ ও জীবনসত্তার মূল আনন্দ নিহিত। জাহেদ স্বাভবিকভাবেই ছবি ও তার সন্তানকে গ্রহণ করে শিল্পীর সংসার ধর্ম শুরু করে। আর সাতদিনের সেই একজিবিশনের চার দিনের মাথা জাহেদ স্ত্রী বিরহে ব্যাকুল হয়ে ঢাকায় ফিরে এসেছে এবং দরজায় কড়া নাড়ার আগেই দরজা খুলে দিয়ে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে 'সরুপাড় সালোয়ার কামিজ পরা' তার স্ত্রী ছবি। এ বর্ণনা দিয়ে উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছদের ইতি। চার দিনের এ-মাথায় ও-মাথায় এভাবে উপন্যাসের শুরু ও শেষ দেখানো হলেও এরই মধ্যে আটকানো হয়েছে জাহেদের শিল্পী জীবনের পুরোটা। ফলে বর্ণনার ধারাটি সফল হোক আর না হোক উপন্যাসের প্রয়োজন মিটিয়েছে নিংসন্দেহে। এছাড়াও একজিবিশনের আরো অনেক শিল্পীর কথা উল্লেখ আছে। যেমন-রায়হান, মুজিদ, আমেদ প্রমুখ। আরো একজন শিল্পীকে পাওয়া যায় একজিবিশনে নয় কাহিনীর ভিতরে। সে হল শিল্পী মুজতবা। এভাবে উপন্যাসের ঘটনাবলির সংগঠকদের কেন্দ্র শক্ত পায়ে দাড়িয়ে আছে শিল্প এবং শিল্পীরা। কিন্তু নাটকীয়ভাবে ও রহস্যজনকভাবে এবং এমনকি হতে পারে লেখক নিয়ন্ত্রণ অভাবে সেই শিল্পীদের, শিল্পকে এবং তাদের শিল্পভাবনাকে নগন্য করে দিয়ে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে বাংলা উপন্যাসের গতানুগতিক বস্তুপ্রেম। একজোড়া যুবক যুবতীর প্রেম।

এ উপন্যাসে বাঙালি সমাজের বীক্ষনে উপস্থাপিত হয়েছে প্রেম নামক শিল্পের বিচ্ছিন্ন বহু চিত্র। এসব চিত্রের যোগফল উপন্যাসের কাহিনী এগুলো সবই প্রেমের কাহিনী। প্রথম কাহিনী জোবেদা খালা ও আহাদ মিয়ার। জৌলুস ও বিলাসের লোভে জোবেদা ছেড়ে যায় আহাদ মিয়াকে এবং বিয়ে করে জনৈক খান সাহেবকে। বড় লোকের বউ হওয়ার শখভিত্তিক এ প্রেমের পরিণতি কী তার বর্ণনা রয়েছে এ উপন্যাসে। উপন্যাসের নায়ক আমাদের সমাজ এবং সমাজের মূল্যবোধ প্রেমের চিত্রগুলোকে কতটা জঘন্য ভাবছে সংশ্লিষ্ট বর্ণনা ও ভাষার তীব্রতা তার প্রমাণ।

উপন্যাসটি একদিকে যেমন জনপ্রিয়, অন্যদিকে তেমনি শিল্প সফল। এতে সমাজবাস্তবতার চিত্রও কোন কোন স্থলে অত্যন্ত সরলভাবে উঁকি দিয়েছে। বস্তুত কাহিনীর বয়ন বিন্যাস, চরিত্র চিত্রণ, প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা ও অন্যান্য অনুষঙ্গ বিবেচনায় তেইশ নম্বর তৈলচিত্র একটি বিশিষ্ট ও অনন্য উপন্যাস। উপন্যাসটি বুলগেরীয় ভাষায় অনুদিত হয়েছে 'পোত্রেৎ দুবাতসাৎ ত্রি' শিরোনামে। পরিচালক সুভাষদত্ত এ উপন্যাসের কাহিনী নিয়ে 'বসুন্ধরা' নামে সিনেমা নির্মাণ করেছেন।

উত্তম পুরুষ

লেখকের নাম : রশীদ করীম
প্রথম প্রকাশ : ১৯৬১
সংস্করণ : ২য়,
প্রকাশক : বিউটি বুক হাউজ
পৃষ্ঠা : ১৬০
মূল্য : ২৫০ টাকা

বাংলাদেশের আধুনিক উপন্যাস নির্মাণকলার অন্যতম পথিকৃৎ শিল্পী রশীদ করিম (১৯২৫-২০১১)। তাঁর নির্মেদ সাবলীল গদ্য কাব্যিক দ্যোতনাময়। সমৃদ্ধ জীবনাভিজ্ঞতা, অনন্য ভাষাভঙ্গি ও স্বকীয় গদ্যশৈলির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে তিনি ঋদ্ধ করেছেন। মানুষ সম্পর্কে অপরিসীম উদারতা নিয়ে, ধর্ম-সমাজ-শ্রেণীগত চেতনা আর বৈষম্য মুছে দিয়ে রশীদ করীম লিখেছেন এক উপন্যাস 'উত্তম পুরুষ'।

উপন্যাসের নায়ক শাকের। সে এক সংখ্যালঘু পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান। শাকেরের দরিদ্র পরিবার যতদিনে তাকে স্কুলে পাঠাতে সক্ষম হয়, ততদিনে শাকেরের ভিতরে একরাশ ঘাত-প্রতিঘাত প্রবেশ করে এক বিবেচক শাকেরের জন্ম দিয়ে ফেলেছে। স্কুলে প্রবেশের সাথে সাথে শাকেরের পরিচয় হয় মুশফিক আর তার বড় বোন সেলিনার সাথে। আরো পরিচয় হয় সলিল, শেখর, অনিমা ও চন্দ্রার সাথে। মূলত মুশফিক ও সেলিনাই শাকেরের নিস্তরঙ্গ জীবনটাকে তরঙ্গায়িত করে। সেলিনা পদে পদে শাকেরকে অপদস্ত করে। ফলে শাকের সেলিনাকে ঘৃনা করে আবার ভালওবাসে। পুরো উপন্যাসে তিনটি নারী চরিত্রের

নৈকট্য লাভ করে শাকের। কিন্তু তাদের পাওয়ার পথে বাঁধা আসে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার। প্রথমত ধরা যাক সেলিনার কথা। বয়সে বড়, পারিবারিক পদমর্যাদাও কয়েক ধাপ উপরে। তাই সেলিনার সাথে সম্পর্ক বেশি দূর গড়ায়নি। দ্বিতীয় ভাললাগার মেয়ে চন্দ্রা। হিন্দু বলে চন্দ্রার সাথে প্রণয় শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যায়। তৃতীয়জন নিহার। তার দিকে যখনই শাকের হাত বাড়িয়ে দেয়, তখনই সে তাকে অপমান করে ফিরে যায়। আখ্যানের সমাপ্তি ঘটেছে শাকেরের কলকাতা থেকে ঢাকা আগমনের মধ্য দিয়ে।

উত্তম পরুষের মূল উপখ্যানের পাশাপাশি আছে কয়েকটি উপখ্যান। তার মধ্যে শাকেরের ছোট বেলার ঈদের আগের দিনের বর্ণনার মধ্যে আশির দশক আগের কলকতার মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি প্রতিচ্ছবি আছে। আছে ঈদের দিনের প্রস্তুতি, খাদ্য সম্ভার, সামাজিকতা এবং ঈদের আনন্দের কথা। উত্তম পুরুষের অনেকটা অংশ নিয়ে আছে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের জটিলতা, সংঘাত ও বিরোধের বিষয়টি। এছাড়াও দেশ বিভাগের ঠিক আগে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের সামগ্রিক অবস্থা নিরুপনের উপন্যাস। দেশবিভাগের প্রেক্ষাপটে শ্রেণীগত বৈষম্য, উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তের অন্দরমহলের ছবি ফুটিয়ে তোলার আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের স্বাতন্ত্র্য ও সহজাত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এ উপন্যাসে।

রশীদ করিম এ উপন্যাসের মাধ্যমে একটি সময়কে ধরে রাখতে চেয়েছেন। চল্লিশের দশকের বাংলাদেশের কথা বলতে চেয়েছেন। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং সাম্প্রদায়িকতার মতো বিষয়গুলো উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন। তবে তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে আঘাত করেন নি। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি মানব জীবনের নানা চাওয়া-পাওয়া ও প্রেম-কামনাকেও ফুটিয়ে তুলেছেন। এককথায় এটি প্রেম-কাম-উদারতা-বিপ্লব আর ভাঙ্গনের উপন্যাস।

ক্রীতদাসের হাসি

লেখকের নাম : শওকত ওসমান
প্রথম প্রকাশ : ১৯৬২
সংস্করণ : ৭ম, ২০১৪
প্রকাশক : সময় প্রকাশ
পৃষ্ঠা : ৮০
মূল্য : ৭৫ টাকা

বাংলা কথাসাহিত্যের যাত্রা শুরু বিভাগপূর্বকালেই। আর এই কথাসাহিত্যের উৎস বিকাশ ও সমৃদ্ধির সাথে একটি পরিচিত নাম শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)। ইতিহাস পরম্পরায় এই দীর্ঘ সময়ের নানা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক ঘটনার তিনি এক নির্মম স্বাক্ষী ও অংশীদার। ক্রমঅগ্রসরমান বাঙ্গালী মুসলিম জীবন-সংস্কৃতি তাঁর চোখের সামনেই ছিল সবসময় এবং এসব ক্ষেত্রে একজন সচেতন জীবনবাদী মানুষ হিসেবে তাঁর অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়। এর বহিপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর লেখায়। তেমন একটি লেখা রূপকধর্মী উপন্যাস 'ক্রীতদাসের হাসি'। ১৯৬২ সালে তিনি এ উপন্যাসটি রচনা করেন, তখন এ দেশে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসন চলছিল। এ উপন্যাসে রূপকাকারে আইয়ুবি স্বৈরশাসনের স্বরূপ এবং পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাকামী মানুষের অন্তর্সত্য ফুটিয়ে তুলেছেন।

দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে, বান্দী কেনা সম্ভব কিন্তু ক্রীতদাসের হাসি না।' -নায়ক তাতারীর এ উক্তিটিই উপন্যাসের মূল কথা। আর এ বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তোলার জন্যই আঙ্গিক কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছেন রূপক এবং কাহিনীর আদল হিসেবে কল্পনা করেছেন আরব্য উপন্যসের আদল। উদ্দেশ্য শাসকদের বিভ্রান্ত করা। এক্ষেত্রে তিনি সফলও হয়েছিলেন। তখনকার শাসকগণ এ উপন্যাসের রূপকী ব্যঞ্জনা তাকে এই উপন্যাসের জন্যই তাকে 'আদমজী সাহিত্য পুরস্ক(১৯৬৬)' প্রদান করেছিল।

উপন্যাসের মূল চরিত্র তাতারী। আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদ বাগদাদের অধিপতি। বিপুল তার পরাক্রম, গগণচুম্বী তার স্বেচ্ছাচারিতা। নিষ্ঠুরতায় যমতুল্য আবার দাক্ষিণাত্যে অতুলনীয়। সব মিলিয়ে এক খাঁটি সামন্ত শাসক। উজিরে আজম জাফর বার্মাকীর কতলাদেশ কার্যকর হওয়ার পর তার মধ্যে মানসিক অস্থিরতা তৈরি হয়। রাতে এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে একদিন দেখেন গোলাম তাতারী ও বান্দি মেহেরজানের প্রণয়রত দৃশ্য এবং শোনেন

আনন্দিত তাতারীর মনখোলা হাসি। সেই হাসি আবার শোনার জন্য বাদশাহ হারুণ তাতারীকে নিয়ে আসেন প্রাসাদে। কিন্তু তাতারী আর হাসে না। শত চেষ্টা করে বিফল হয়ে হারুণ যখন দুঃখে, ক্ষোভে চরম উত্তেজিত। তখনই তাতারী বলে উঠে- 'শোনেন হারুনুর রশীদ। দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে, বান্দী কেনা সম্ভব কিন্তু ক্রীতদাসের হাসি না না-না-না।' এ উক্তিটিই উপন্যাসের জীবনদর্শন।

রূপকাশ্রয়ী এ উপন্যাসের পটভূমি হচ্ছে- ষাটের দশকের পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ। ১৯৫৮ সালে আউয়ুব খানের বর্বর স্বৈরশাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট পাকিস্তান। এ সময় সব ধরণের বাক্ স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল। তৎকালীন পাকিস্তানের স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের শাসন ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করে এ উপন্যাস রচিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক চেতনাকে ভয় পায় এ স্বৈরাচারি শাসক। এ চেতনাকে দমন করার জন্য আবার নেমে আসে আবার সামরিক শাসন। তবুও লেখকের প্রতিবাদ স্তব্ধ থাকেনি। রূপকের মধ্য দিয়ে তীর হয়ে উঠেছে এই প্রতিবাদ। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি'র তাতারী।

নাট্যিকরীতিতে রচিত এ উপন্যাসটির বর্ণনা উত্তমপুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে শুরু হলেও বেশিরভাগ বর্ণনায় সর্বজ্ঞদৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে। তবে কখনো কখনো বিভিন্ন চরিত্রের দৃষ্টিকোণও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন উপন্যাসে ধৃত জীবনদর্শনের উপর আলো ফেলেছেন তাতারীর দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে। খলিফা হারুনুর রশিদের ভাষা ও এক স্বতন্ত্র জীবন-সংস্কৃতি ফুটিয়ে তুলতে শওকত ওসমান উপন্যাস বর্ণনার ভাষা নির্মাণে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি মাত্রায় আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

সময় ও রূপক-ফ্যান্টাসির শিল্পকে ধারণ করে 'ক্রীতদাসের হাসি' বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। উপন্যাসটি মূলত বাংলাদেশের ষাটের দশকের সাংস্কৃতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক-ঐতিহাসিক বাস্তবতার শিল্পিত রূপ।

হাজার বছর ধরে

লেখকের নাম : জহির রায়হান
প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৪
সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০৩
প্রকাশক : অনুপম প্রকাশনী
পৃষ্ঠা : ৬০
মূল্য : ৭০ টাকা

বাংলা কথাসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ লেখক জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২)। বাঙ্গালী জীবন ঘনিষ্ঠ রচনার অন্যতম কারিগর জহির রায়হানের লেখায় বাংলার গ্রাম ও শহুরে মানুষের জীবন কাহিনীই প্রাধান্য পেয়েছে। মানুষের জীবনের অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক ও মনস্তাত্ত্বিক নানা সংকট, যাপিত জীবনের প্রাত্যহিক ও চিরকালীন সংকট নিবিড় মমতায় ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর লেখায়। জহির রায়হানের বিখ্যাত উপন্যাস 'হাজার বছর ধরে'। এ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন যুগ-যুগান্তরের আবহ সংকুল অথচ বিবর্তনহীন পূর্ববাংলার গ্রামীণ জীবনের প্রকৃত চালচিত্র।

পূর্ববাংলার একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে বাংলার সকল গ্রামের মর্মকথা তুলে ধরেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। সেই গ্রামে নদী বয়ে যায় আপন গতিতে। গাছে গাছে ফুল ফোটে। আকাশে পাখি উড়ে। হাজার বছর ধরে যেই জীবন ধারা বয়ে চলেছে, তাতে আশা-নিরাশা, প্রেম-ভালবাসা, চাওয়া-পাওয়ার খেলা চললেও তা সহজে চোখে পড়ে না। অন্ধকারে ঢাকা থাকে। কঠিন অচলায়তন সমাজে আর যাই থাকুক নারীর অধিকার সীমিত। নারী নিজের ইচ্ছেমত কাউকে ভালবাসতে পারবেনা, বিয়ে করতে পারবে না। সমাজে এগুলো গুরুতর অপরাধ। অন্ধকার সমাজের আনাচে কানাচে বাস করে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, নারী নির্যাতন ইত্যাদি। অশিক্ষিত এ জনগনের মধ্যে কুসংস্কারেরও অভাব নেই। তাদের ধারণা রোগ বালাই দেব দেবীর কুদৃষ্টির ফল। উপন্যাসে. ক্ষুদ্র একটি গ্রামের একান্নবর্তী পরিবারের সংঘাতময় জীবনের কাহিনী তিনি বর্ণনা করেছেন এতে। পরিবারটির কর্তা মকবুল বুড়ো।

পরীর দীঘির পাড়ের একটি গ্রাম উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। এই গ্রামের গোড়াপত্তন হয়েছিল কবে তা কেউ জানে না। এক বন্যায় পানির ভেলায় ভাসতে ভাসতে কাশেম শিকদার আর তার বউ আশ্রয় নিয়েছিল এই জায়গায়। সেই থেকে শিকাদর বাড়ির পত্তন। শিকদার বাড়িতে আট ঘর লোকের বাস।

এর মধ্যে রয়েছে বৃদ্ধ মকবুল ও তার তিন স্ত্রী, আবুল, রশিদ, ফকিরের মা, মন্টু। সবাই নিম্নবৃত্ত শ্রেণীর, জীবিকার তাগিদে সবাইকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। হাজার বছর ধরে চলে আসছে গ্রাম বাংলার মানুষের এ জীবনযুদ্ধ। বৃদ্ধ মকবুলের তৃতীয় স্ত্রী কিশোরী টুনি গ্রাম বাংলার এক উচ্ছল কিশোরীর প্রতীক। সে মকবুলের শাসন মানতে চায় না। সে চায় তার নিজের মত চলতে, ঘুড়ে বেড়াতে। সে তার সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয় অল্প বয়সী মন্টুকে। মন্টু বাবা-মা হারা অনাথ, বিভিন্ন কাজ করে বেড়ায়। টুনি আর মন্টু রাতের আধাঁরে মাছ ধরতে যায়, বর্ষায় শাপলা তুলতে যায়। এমনি করে দুজন দুজনের কাছে চলে আসে। ভালবাসার জোয়ারে ভাসে দুজন কিন্তু কেউ কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারে না।

একসময় মকবুল মারা যায়। মন্টু যখন তার মনের কথা টুনিকে বলে তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। সময় গড়িয়ে যায়, টুনির সঙ্গে মন্টুর দেখা হয় নি অনেক দিন ধরে। টুনি হারিয়ে যায় তার জীবন থেকে তবু টুনির কথা মাঝে মাঝে তার মনে পড়ে। একদিন রাতের বেলা সুরত আলীর ছেলে ওর বাপের মতোই পুঁথি পড়ত। একই তালে, একই সুরে হাজার বছরের অন্ধকার ইতিহাস নিয়ে এগিয়ে চলে সবাই। হাজার বছরের পুরানো জোৎনা ভরা রাতে একই পুঁথির সুর ভেসে বেড়ায় বাতাসে।

কালের আবর্তে সময় গড়ায়। প্রকৃতিতেও পরিবর্তন আসে। শুধু পরিবর্তন আসেনা অন্ধকার, কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম বাংলার অচলায়তন সমাজে।

জহির রায়হান তার হাজার বছর ধরে উপন্যাসের মধ্যে যেভাবে আবহমান বাংলার স্বকীয়তা ও ধারাবাহিকতাকে বেধেঁছেন এক কথায় অসামান্য। বাংলা সাহিত্যে এমন কালোজয়ী উপন্যাস খুবই কম।

সংশপ্তক

লেখকের নাম	: শহীদুল্লা কায়সার
প্রথম প্রকাশ	: ১৯৬৫
সংস্করণ	: ২০১২
প্রকাশক	: চারুলিপি
পৃষ্ঠা	: ৪০০
মূল্য	: ২৫০ টাকা

পঞ্চাশের দশকের আধুনিক কথাসাহিত্যিক শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-১৯৭১)। সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত এ সাহিত্যিকের লেখক-মানস গঠনে সমকালীন আর্থ-সমাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অনেক বেশি প্রভাব ফেলেছে এবং তাঁর রচনার বিষয় হিসেবেও সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিই প্রাধান্য পেয়েছে। শহীদুল্লাহ কায়সারের এক কালজয়ী উপন্যাস 'সংশপ্তক'(১৯৬৫)। এর বৃহত্তম পটভূমিতে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঘটনা। এ উপন্যাসের কাহিনী শুরু হয় ইংরেজ আমলের অন্তিমকালে ও পাকিস্তান আমলের সূচনালগ্নে। কাহিনীর অনেকখানি স্থাপিত হয়েছে পূর্ববঙ্গের গ্রামঞ্চলে, খানিকটা কলকাতা ও ঢাকায়।

তিরিশের দশকের আশেপাশে বাংলার এক কোন এক ছোট্ট গ্রাম বাকুলিয়া। গ্রামের এক প্রান্তে সৈয়দ বাড়ি, আরেক প্রান্তে মিয়া বাড়ি। মিয়া বাড়ির প্রধান এ অঞ্চলের জমিদার মিয়ার ব্যাটা আর সৈয়দ বাড়ির প্রধান আপন ভাইবোন। সৈয়দ বাড়ির প্রধানের ছেলে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, প্রগতিশীল ও আধুনিক শিক্ষিত যুবক। ঐ বাড়িতে আরো থাকে সৈয়দ বাড়ির প্রধান পীরের মেয়ে বাবেয়া ওরফে রাবু। মিয়ার ব্যাটার নায়েব অত্যন্ত ধুরন্ধর রমজান। মিয়ার ব্যাটা ট্রাডিশনাল বংশগরিমায় অহংকারী বদমেজাজী জমিদার। প্রজাদের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে তার খুব একটা চিন্তাভাবনা নাই। এদের পাশাপাশি গ্রামে আরো আছে খেটে খাওয়া মানুষ লেকু, তথাকথিত নষ্টা ও সমাজচ্যুত হুরমতি, আদর্শবাদী স্কুল শিক্ষক। আর নিম্নবিত্ত পরিবারের সদ্য কিশোর মালু। এরাই হচ্ছে উপন্যাসের মূল চরিত্র।

উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে শাখা-প্রশাখাসমেত সৈয়দ পরিবারের কথা। সে পরিবারের এক সৈয়দ প্রাচীনপন্থী নানা সংস্কারের সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজের চাকরি সমন্বিত করেছেন। আরেক সৈয়দ স্ত্রী-কন্যা ফেলে নিরুদ্দেশ

যাত্রা করে দরবেশ হয়েছেন। প্রথমোক্তজনের পূত্র জাহেদ আধুনিক শিক্ষা জীবন বোধ আয়ত্ত করে প্রথমে পাকিস্তান আন্দোলন এবং বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। প্রাচীনতার সঙ্গে তার ভয়াবহ দ্বন্দ্ব। তাই পিতৃব্য যখন তার এক বয়স্ক শিষ্যের সাথে কন্যা রাবুর বিয়ে দিয়ে ফেলেন, তখন সে তার সমর্থকদের নিয়ে নতুন বরের উপর এমন হামলা চালায় যে জামাতা শুধু নয়, সদলবলে শ্বশুরকেও পলায়ণ করতে হয়। রাবুও এ ঘটনাকে বাড়াবাড়ি মনে করে। কিন্তু পরে জাহেদের শিক্ষার প্রভাবে ওই স্বামীকে স্বামীত্বের অধিকার দিতে অস্বীকার করে। আর প্রাচীনপন্থি মিথ্যা অহমিকায় আচ্ছন্ন ও লুপ্ত বংশ গৌরবের মেকি ব্যক্তিত্ব কীভাবে কালের আবর্তে হারিয়ে যায় তাই ফুটিয়ে তুলেছেন মিয়া বাড়ীর উল্লেখে।

উপন্যাসের কাহিনী সুস্পষ্টভাবে দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে দেখা যায় বাকুলিয়া গ্রামের মানুষের জীবনকাহিনী, জমিদারের শোষণ, নায়েবের কুটচাল ইত্যাদি। এটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়। এ সময়ে উপন্যাসের কাহিনীর কেন্দ্রেবিন্দুতে আসে বাকুলিয়া গ্রামের মালু। মালু বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে একটি গানের দলে যোগ দেয়। আস্তে আস্তে নিজের যোগ্যতাবলে শীর্ষপর্যায়ে পৌছে যায়। কাজ করতে শুরু করে কলকাতা বেতারে। এদিকে বাকুলিয়াতে রমজান নানা কুটবুদ্ধিতে জমিদার মিয়ার ব্যাটাকে সরিয়ে নিজেই জমিদার বনে যায়। ৪৩-এর মন্বন্তরের সময় মুনাফালোভী খাদ্য ব্যবসায়ীদের সাথে হাত মিলায়। ৪৬-এর ভয়াবহ দাঙ্গার সুযোগ নিয়ে হিন্দুদের ঘরবাড়ি দখল নেয়। এভাবে রাজনৈতিক নানা পটপরিবর্তনের সাথে সাথে নিজের বেশ বদলে ফায়দা লুটে। এভাবে অনেক টাকার মালিক হয়ে সমাজের কর্তৃত্ব স্থানীয় পদ দখল করে। কানকাটা রমজান থেকে হয়ে যায় কাজী মোহাম্মদ রমজান। রমজানের বহুল ব্যবহৃত ডায়লগ- এসডিও সাহেবকে আমি সামলাব, আমার নাম কাজী মোহাম্মদ রমজান।

অন্যদিকে জাহেদরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের নৈতিক লড়াই চালিয়ে যায়। রাজনৈতিক পটপরিবর্তিত হয়, সমাজের উত্থান-পতন হয় কিন্তু তাদের কোন পরিবর্তন হয় না। ৪৩-এর মন্বন্তর, ৪৬-এর দাঙ্গা এসব পরিস্থিতিতে রমজানরা যখন কাড়ি কাড়ি টাকার মালিক হচ্ছিল তারা তখন আন্দোলন-সংগ্রাম ও মানুষের সেবা করে নিঃশেষিত হচ্ছিল। তবু তারা এ মানবতার এ পথ ছাড়েনি। মানব সেবায়ই নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছে। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় মালু শহর থেকে গ্রামে ফিরে এসে দেখে গ্রামের রাস্তায় রমজানের লাল গাড়ী। অন্যদিকে বামপন্থী রাজনীতির সাথে জড়িত থাকার কারণে জাহেদকে

পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। জাহেদের জন্য অপেক্ষার পালা শুরু হয় রাবুর এবং মালু তাদের এই সংগ্রামের পথে শরিক হয়। জাহেদ-রাবুর প্রেমের স্থিতি ও তাদের সংগ্রামের অব্যাহত ধারায় উপন্যাসটি শেষ হয়। পরাজয়ে না ডরে জয় না পাওয়া পর্যন্ত লড়ে যে সৈনিক তাকে বলে সংশপ্তক। এখানে জাহেদরা সবাই সংশপ্তক।

শহীদুল্লা কায়সারের বোনের মতানুসারে তাদের পারিবারিক অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি এ উপন্যাসটি রচনা করা হয়েছে। তাছাড়া রাজনৈতিক চেতনাতো তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লব্ধ। এ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে রচিত সংশপ্তক উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাসে সমকালীন আর্থ-সমাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনা করে মূলত বাংলাদেশের এক সংকটকালীন ইতিহাসকে চিত্রিত করেছেন। তাছাড়া সুযোগ সন্ধানীদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা (রমজান) ও নীতিবানদের আজীবন সংগ্রামের (জাহেদরা) যে জীবনদর্শন তিনি উপন্যাসে ব্যক্ত করেছেন তা আজকের সমাজেও সত্য।

ঔপন্যাসিক বৃহদাকার এই উপন্যাসের কাহিনী বয়নে প্রচলিত গঠন-কাঠামো ব্যবহার করে সরল বর্ণনা করেছেন। চরিত্রের প্রয়োজনানুসারে ভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন শহরের চরিত্রের মুখে চলিত ভাষা এবং গ্রামীণ চরিত্রের মুখে গ্রামের আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করেছেন। তবে উপন্যাসের গাঁথুনি সর্বত্র আটসাঁট থাকেনি কোথাও হয়তো ছাড়া ছাড়া ভাব লক্ষ্যণীয়। গঠন কাঠামোর এসব সংকীর্ণতা থাকলেও তাকে ছাপিয়ে এটি তখন শীর্ষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি কালজয়ী উপন্যাস হিসেবে স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছে।

কাঁদো নদী কাঁদো

লেখকের নাম : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৮
সংস্করণ : ৮ম, ২০১২
প্রকাশক : নওরোজ কিতাবিস্তান
পৃষ্ঠা : ১৩৬
মূল্য : ১৫০ টাকা

বিংশ শতাব্দীর বাংলা কথাসাহিত্যের ভিন্নমাত্রিক রূপকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭৪)। তাঁর রচনাসমূহ গভীর জীবনবোধ, অন্তর্লোকের রহস্য উন্মোচন স্পৃহা, কুসংস্কারমুক্ত ও স্পষ্টবাদী উচ্চারণে সমৃদ্ধ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহুমাত্রিক জীবনাচরণের অভিজ্ঞতা থাকার ফলে অস্তিত্ববাদ, অভিব্যক্তিবাদ, মনোবিকলন তত্ত্ব প্রভৃতি তিনি আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। ফলে তাঁর সাহিত্য হয়ে উঠেছে বৈশ্বিক জীবনমথিত অভিজ্ঞান। এসব পাশ্চাত্য তত্ত্বকে আত্মস্থ করে নিজস্ব ভঙ্গিতে সাহিত্যে প্রতিফলিত করেছেন। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় তাঁর চৈতন্যপ্রবাহ রীতিতে রচিত উপন্যাস কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮)। আঙ্গিক গঠনে পাশ্চাত্যের প্রভাব থাকলেও এর সমাজজীবন, পরিবেশ ও চরিত্রসমূহ স্বদেশীয়।

তবারক ভূঁইয়া নামক এক স্টীমার যাত্রীর মুখে বিবৃত কুমুরডাঙ্গার ছোট হাকিম মুহাম্মদ মুস্তফার জীবনালেখ্য ও অর্ন্তজীবনের ইতিকথা উপন্যাসের বিষয়বস্তু। প্রকৃতপক্ষে তা মুহাম্মদ মুস্তফার অবচেতন মনের বিবৃতি। গ্রামের ছেলে মুস্তফা উচ্চশিক্ষা নিয়ে শহরে বিচারক পদে চাকুরি কালে চাকুরী ও পারিপার্শ্বিক বিষয় নিয়ে মানসিক দ্বন্দ্বে পড়ে। একপর্যায়ে নিকটাত্মীয়া খোদেজা আত্মহত্যা করলে মোস্তফাও আত্মহত্যা করে। অন্যদিকে বাকল নদীতে চর পরায় টিকেট মাস্টার খতিবসহ সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এরূপ উপন্যাসের জন্য আঙ্গিকের পাশাপাশি চরিত্র ও আখ্যানভাগও আপাত জটিল ও খাপছড়া বলে প্রতিভাত হয়। একদিকে নিয়তি মুহাম্মদ মুস্তফার করুণ জীবনালেখ্য, অন্যদিকে শুকিয়ে যাওয়া বাকাল নদীর প্রভাবতাড়িত কুমুরডঙ্গার মানুষের ব্যতিব্যস্ত জীবনচিত্র ও নিসর্গ, বাস্তব ও পরাবাস্তব, মানবচৈন্য ও অবচেতনা, বিশ্বাস ও কুসংস্কার সবকিছু মিলে অস্তিত্ববাদ ও নিয়তিবাদের সমন্বয়ে এক অভিনব ও জটিল শৈল্পিক নৈপুণ্যে নিপুণ গ্রন্থখানি বাংলা উপন্যাসে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

পাপের সন্তান

লেখকের নাম : সত্যেন সেন
প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৯
সংস্করণ : জুলাই ২০০৯
প্রকাশক : মুক্তধারা
পৃষ্ঠা : ২২৪
মূল্য : ২৫০ টাকা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি প্রোজ্জ্বল নাম সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১)। 'উদীচী'র প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে খ্যাত সত্যেন সেন জীবনের সবটুকু বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। মানুষ ও সমাজের প্রগতির জন্য যারা নিজ জীবন উৎসর্গ করে তিনি ছিলেন তেমন বিরল প্রজাতির একজন মানুষ। মাটি ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি লেখালেখি করেছেন। ব্রিটিশ আমলে আন্দোলন করে কারাবন্দি হলে তিনি জেলে বসেও নিরন্তর লেখালেখি করেছেন। জেলে যখন পত্রিকা বন্ধ করে দিয়ে বাইবেল দেয়া শুরু করল তিনি তখন বাইবেলের কাহিনী নিয়ে দুইটি উপন্যাস 'অভিশপ্ত নগরী' ও 'পাপের সন্তান' রচনা করেছেন। আমাদের আলোচ্য উপন্যাস 'পাপের সন্তান'।

'পাপের সন্তান' উপন্যাসের ভূমিকাংশে ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসকে অভিশপ্ত নগরীর দ্বিতীয় খন্ড হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ দুটি উপন্যাসের ঘটনা কালের ব্যবধান প্রায় অর্ধশতাব্দীর কিছু উপর। অভিশপ্ত নগরী উপন্যাসে জেরুজালেম নগরীর পতনের কথা আছে। এ পতন সাধারন পতন নয়, ব্যবিলনরাজ নেবুচাঁদ নেজার জেরুজালেমকে ধ্বংস্তুপে পরিণত করে নগরীর নাম নিশানা মুছে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় অধিবাসীদের তাড়িয়ে নিয়ে গিছেন ব্যবিলনে। দীর্ঘদিন ধরে সেখানে তাদের নির্বাসিত জীবন যাপন করতে হয়েছিল। পাপের সন্তানে সেই পতনের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। কালের পরিক্রমায় পারসিকদের আক্রমণে ব্যবিলন সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ব্যবিলন সাম্রাজ্যভূক্ত এলাকা পারসিকদের অধীনে চলে যায়। ব্যবিলনে নির্বাসিত ইহুদিরা জেরুজালেমে ফিরে যাবার জন্য আবেদন করতে থাকে। অবশেষে পারস্যরাজ তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন এবং তার ইহুদী পানপাত্রবাহক নেহেমিয়াকে জেরুজালেমের শাসনকর্তা হিসেবে পাঠালেন। নেহেমিয়ার নেতৃত্বে ইহুদীরা জেরুজালেমের বিধ্বস্ত প্রাচীর নতুন

করে গড়ে তুলে। কাজটা সহজ ছিলনা। তবু হহুদী জনসাধানের প্রচেষ্টায় নতুন জেরুজালেম গড়ে উঠে। কিন্তু ইহুদী সমাজপতিদের ধর্মের গোড়ামি, কঠিন রক্ষণশীল মনোভাব ও তীব্র পরজাতিবিদ্বেষ সমাজকে এক আত্মবিধ্বংসী আবর্তের দিকে ঠেলে নিয়ে চলে।

পারসিকদের অধীনে থাকাকালে ইহুদিদের সঙ্গে অন্য ধর্ম-জাতির অনেকেরই বিয়ে এবং সন্তান জন্মের ঘটনা ঘটে। পরজাতি স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী ইহুদি সন্তানদের পাপের সন্তান বলে আখ্যায়িত করে তাদের ধ্বংস কামনা করা হয়। এই উপন্যাসের প্রধান পাত্র-পাত্রী মিকা ও শদরা ধর্মীয় ও সামাজিক এই বিধি নিষেধ অতিক্রম করে নীলনদের তীরে এসে নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে চায়। এই নতুনের প্রতি ইঙ্গিতই উপন্যাসের মূলকথা।

এটি শুধু সত্যেন সেনেরই সেরা সৃষ্টি নয়, বাংলা ভাষায় লিখিত একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এ উপন্যাসের জন্য লেখক বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৭০) লাভ করেন।

নন্দিত নরকে

লেখকের নাম	: হুমায়ুন আহমেদ
প্রথম প্রকাশ	: ১৯৭২
সংস্করণ	: ২য়, ২০০৮
প্রকাশক	: অন্যপ্রকাশ
পৃষ্ঠা	: ৭০
মূল্য	: ১৮০ টাকা

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে সর্বোচ্চ পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন হুমায়ুন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২)। বাংলা সাহিত্যে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের পর তিনিই এতটা পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও অনেকটা প্রাণের টানেই সাহিত্য চর্চা করেন। বিষয় ও কাঠামোগত দিক দিয়ে দেশীয় আবহ ও লোকজ অনুষঙ্গে সমৃদ্ধ তাঁর সৃষ্টিকর্মের কেন্দ্রে ছিল মানবিক চিন্তার বিকাশ। তিনি একান্ত সরল ভাষা ব্যবহার করে অত্যন্ত সহজভাবে তাঁর গল্প উপস্থাপন করে নিমিষেই পাঠক হৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন। তাঁর পাঠকপ্রিয়তার মূল কারণই ছিল গল্প বলার সহজ ভাষা ও ভঙ্গী। তিনি বিষয়

নির্বচনের ক্ষেত্রে তাঁর সমকালীন সমাজের সাধারণ মানুষের জীবনকে প্রাধান্য দিতেন। তবে এক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্রের পরিচয় দিয়েছেন। সমাজের ব্যতিক্রমধর্মী, অবহেলিত ঘটনাগুলোতে আলো ফেলে মানবিক দিক ফুটিয়ে তুলেছেন। এমনি এক ব্যাতক্রমী গল্পের মানবিক আবেদনের কাহিনী নিয়ে রচিত হুমায়ুন আহমেদের প্রথম উপন্যাস 'নন্দিত নরকে' (১৯৭২)। এ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় প্রখ্যাত সাহিত্যিক আহমদ ছফার উদ্যোগে। আর স্বপ্রণোদিত হয়ে উপন্যাসটির ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক আহমদ শরীফ।

নন্দিত নরকে হুমায়ুন আহমেদের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস হলেও এটি ছিল তার লেখা দ্বিতীয় উপন্যাস। হুমায়ুন আহমেদ এটি লিখেছিলেন ১৯৭০ সালে তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়নরত এবং মোহসীন হলের আবাসিক ছাত্র।

উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের হাসি-কান্না ও সংগ্রাম-অসহায়ত্বের কাহিনী। 'নন্দিত নরকে' উপন্যাসটি প্রথম পুরুষে লেখা। লেখকই উপন্যাসের কাহিনী কথক। নামও থাকে হুমায়ুন। বইটিতে কোন চরিত্র প্রধান বলা যায় না। কুয়াশায় ঘেরা, স্বপ্নে ভরা এক মধ্যবিত্তের সংসার। এখানে যেন প্রধান হয়ে উঠেছে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন সংগ্রাম, দু:খ, কষ্ট, হাসি-কান্না, যৌনতা। এ পরিবারে সদস্য হচ্ছে; বাবা-মা, তাদের সন্তান রাবেয়া, খোকা, মন্টু আর রনু। খোকা পড়াশোনায় বেশ মনোযোগী হওয়ায় পরিবারের সবার স্বপ্ন তাকে নিয়ে। মন্টু একটু খেয়ালি স্বভাবের, সারাদিন খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। রাবেয়া মানসিক প্রতিবন্ধী, খোকার এক বছরের বড়। তাকে নিয়ে সবার অসম্ভব চাপা কষ্ট। রনু সবার ছোট বোন। এ পরিবারের সাথে আরও থাকে আশ্রিত এক মাষ্টার, খোকার বাবার বন্ধু।

একদিন রাবেয়া হারিয়ে যায়। ওকে খুঁজে বের করে আনেন মাষ্টার কাকা আর বাবার প্রথম ঘরের সন্তান মন্টু। এ ঘটনার কিছুদিন পরেই সন্তানসম্ভবা হয় রাবেয়া। পাগল মেয়ের সাথে কে কখন কি করেছে সে বলতে পারে না। হঠাৎ অবিবাহিত মেয়েটি সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়লে পরিবারটি বিপদে পড়ে যায়। এই সঙ্কটের মধ্য দিয়ে তাদের দিন অতিবাহিত হতে থাকে। গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে মেয়েটি মারা যায়। মন্টু মেয়েটির মৃত্যুর জন্য মাষ্টার কাকাকে দায়ী মনে করে তাকে খুন করে বসে এবং আদালতের রায়ে তার ফাঁসি হয়ে যায়।

উপন্যাসে লেখক সমাজের অবাঞ্ছিত দিক তুলে ধরেছেন। রাবু প্রতিবন্ধী হলেও পরিবারের সান্নিধ্যে আনন্দে-দুঃখে কেটে যচ্ছিল তার দিন। কিন্তু হঠাৎ থমকে

যায় তার জীবন। মাষ্টার কাকার পাশবিকতার কাছে হার মানে রাবেয়ার সব রকম উচ্ছলতা। এ অবাঞ্ছিত ঘটনা গোটা পরিবারকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়। এই মাষ্টার কাকা চরিত্রের মাধ্যমে সমাজে ভদ্রতার মুখোশধারী অসচ্চরিত্রের লোকদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। উপন্যাসে এ চরিত্রকে বাঁচিয়ে রাখেননি। বাস্তবেও এসব চরিত্রের বিনাশই কামনা করেছেন।

সহজ-সরল উপস্থাপনার জন্য প্রথম উপন্যাসের মাধ্যমে যে জনপ্রিয়তা হুমায়ুন আহমেদ অর্জন করেছিলেন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তা ধরে রাখতে পেরেছিলেন। নন্দিত নরকে তাঁর প্রথম উপন্যাস হলেও সাহিত্যিক বিচারে প্রশংসিত হয়েছিল এবং বিশেষজ্ঞদের মতে এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার দাবিদার। শেষের দিকে তরুণ প্রজন্মই ছিল তাঁর সাহিত্যের প্রধান পাঠক। তাঁর সৃষ্ট 'হিমু','রূপা' চরিত্র কাল্পনিক হলেও ছিল সর্বজন পরিচিত। তাছাড়া তাঁর নাটক ও চলচ্চিত্র সব বয়সের সবশ্রেণীর মানুষের মন জয় করেছে। নন্দিত নরকে উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের নতুন দ্বার উন্মোচন করেছিলেন। যার উত্তরসুরী হয়েছে আনিসুল হক ও ইমদাদুল হক মিলনের মত কথাসাহিত্যিকগণ।

আমার যত গ্লানি

লেখকের নাম : রশীদ করীম
প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৩
সংস্করণ : ১ম,
প্রকাশক : বিউটি বুক হাউজ
পৃষ্ঠা : ১৯২
মূল্য : ৩০০ টাকা

বাংলাদেশের আধুনিক উপন্যাস নির্মাণকলার অন্যতম পথিকৃৎ শিল্পী রশীদ করিম (১৯২৫-২০১১)। তাঁর নির্মেদ সাবলীল গদ্য কাব্যিক দ্যোতনাময়। সমৃদ্ধ জীবনাভিজ্ঞতা, অনন্য ভাষাভঙ্গি ও স্বকীয় গদ্যশৈলির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে ঋদ্ধ করেছেন। তার উপন্যাসে সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষের ভিন্ন পরিস্থিতিতে বহিঃ ও অন্তর্লোকের পরিচয় পাওয়া যায়। রশীদ করীমের 'আমার যত গ্লানি' উপন্যাস দীর্ঘ বিরতি দিয়ে প্রকাশিত হয়। এ উপন্যাসে তিনি কাহিনী

বুননে পরিবর্তন এনেছেন। এই উপন্যাসের কাহিনী পুরোপুরি নগরজীবন ভিত্তিক।

আলোচ্য উপন্যাসে ১৯৪৭ সাল থেকে ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে মধ্যকার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ৭০এর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নির্বাচন, গণপরিষদের অধিবেশন, ৭ই মার্চের ভাষণ, যুদ্ধের কবলে দেশ ও জাতি- এ বিষয়গুলো মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের মননে কী রকম প্রভাব বিস্তার করেছিল তারই ধারাবাহিক ছবির নির্যাস এ উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধকে আবর্তিত করে মধ্যবিত্ত বঙ্গালির দ্বিধা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের উন্মোচন করেছে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এরফান চৌধুরীর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের উচ্চমধ্যবিত্ত নাগরিক শ্রেণীর চেতনাকে আবিস্কার করেছেন লেখক। যৌন তাড়নায় উজ্জীবিত এরফান চৌধুরীর আত্মসূখ সন্ধানী মনোবিশ্লেষণ এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঢাকার একটি বহুজাতিক ফার্মের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এরফান। অফিসের পর ক্লাবে বসে মদপান ও নারীসঙ্গ বিশেষত মধ্যবয়সী সুন্দরী আয়েশার সাথে সময় কাটানো তার কাজ। তার আত্মকথন লক্ষণীয়- 'আমি লোকটি আসলে একটা খচ্চর। যদিও আমার বাপ লোকটা মোটের উপর ভালই ছিল.... বেসিনের উপরে বেলজিয়ান কাচের আয়নায়। যে মুখটি ফুটে উঠেছিল তা সাগর পারের ঐ মহার্ঘ্য বস্তুটির মান বজায় রেখেছে ঠিকই। খাসা লাগল চেহারাটি. সামান্য একটু নড করে আমি আমার অনুমোদন জানালাম চেহারাটা ভাল ঠেকলে, চালচলনে, দিব্বি একটা কনফিডেন্স আসে। অথচ এই একই আমি সারাবাত বেলেল্লাপনা করে সকাল বেলা খরখরে চোখ নিয়ে উঠি, তখন নিজেকেই অন্য মানুষ মনে হয়।'

এখানে এরফান চৌধুরী সম্পর্কে লেখকের বর্ণনা ও এরফান চৌধুরীর কথনে কাহিনী বিবৃত হয়েছে। তবে আয়েশা আর তার স্বামী সামাদ সাহেব এবং আহসান, নবী, আক্কাস, আবেদ, কোহিনুর চরিত্রগুলো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেনি তাদের সাথে এরফানের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মিশে গেছে। উপন্যাসের আর্থ-বাস্তবতা উন্মোচনে উপন্যাসটি বিশিষ্ট। তবে লেখক মুক্তিযুদ্ধের শাণিত চেতনা ও অভিঘাতের মূল্যায়নের পরিবর্তে মধ্যবিত্তের যৌনচেতনা ও স্বার্থপরতা এবং জনবিচ্ছিন্নতার ঘটনা উন্মোচনে বেশি মনযোগী। এরফানকে জমির যখন জিজ্ঞাসা করে কোথায় যাচ্ছেন তখন সে বলে- 'শেখ সাহবের কাছে। স্বাধীনতার কাছে'। কিন্তু আয়েশার শারীরিক প্রেমের আকর্ষণ তার কাছে মূখ্য। ২৫শে মার্চের ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেও সে মুক্তিযুদ্ধের গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। ক্ষুদ্রবৃত্তে চলমান জীবনে যুদ্ধজীবনের অভিঘাত সত্য হয়ে ধরা দেয়নি।

বরং জনবিচ্ছন্নতার জন্য গ্লানি জেগেছে, আত্মধিক্কারও। তবে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আত্মকেন্দ্রিক এরফান চৌধুরীও বাইরের রাজনৈতিক উত্তাপ ও ঘটনা প্রবাহকে অস্বীকার করতে পারে নি। উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধপূর্ব রাজনৈতিক ঘটনাগুলোর ধারাবাহিকতা আখ্যানে বিন্যস্ত হয়েছে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের স্বপ্ন অলক্ষে থাকে নি।

নতুন সৃষ্ট রাজধানী শহর ঢাকার প্রেক্ষাপটে নগর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। পাশাপাশি পাকিস্তান শাসনামল ও নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষের পরিপ্রেক্ষিতে সমকালীন জীবনকে প্রতিফলিত হয়েছে উপন্যাসটিতে।

রাইফেল রোটি আওরাত

লেখকের নাম : আনোয়ার পাশা
প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৩
সংস্করণ : ৪র্থ, ফেব্রুয়ারি ২০০৫
প্রকাশক : স্টুডেন্ট ওজেয়
পৃষ্ঠা : ১৮০
মূল্য : ২৫০ টাকা

'রাইফেল রোটি আওরাত' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মেধাবী শিক্ষক আনোয়ার পাশার (১৯২৮-১৯৭১) লেখা একটি উপন্যাস ।

'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসটির প্রথম পরিচয় হচ্ছে এটি বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত সর্বপ্রথম উপন্যাস এবং এটিই একমাত্র উপন্যাস যেটি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে লেখা হয়। ঔপন্যাসিক একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এপ্রিলে উপন্যাসটি লেখা শুরু করে জুনে শেষ করেন। যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী বাহিনী রাইফেলের মুখে আমাদের অস্তিত্ব হরণ করে রোটি অর্থাৎ আমাদের খাদ্যের যোগানে বাঁধা সৃষ্টি করে এবং আওরাত হচ্ছে সেই তিন লক্ষ মা বোন যাদের সম্ভ্রম কেড়ে নেয় সেই হানাদার বাহিনী। রাইফেল রোটি আওরাত বলতে লেখক এটিই বুঝাতে চেয়েছেন।

২৫ মার্চ কালরাতে বাংলাদেশ যে মৃত্যুর বিভীষিকায় ডুবেছিল তার ভেতরের রক্ত, লাশ আর নরক সমান ভয়াবহতা ও নির্মম হত্যাকন্ডের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন আনোয়ার পাশা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করে খুব

কাছ থেকে পাক হানাদার বাহিনীর বীভৎস অত্যাচার-নির্যাতন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অবরুদ্ধ থেকেই তিনি তার কথা লিখলেন উপন্যাসে। ২৫ মার্চের পরের তিন দিনের গল্প, এই গল্প ইতিহাস, এই গল্প একাত্তরের রক্তের ডাক্।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুদীপ্ত শাহীন। আসলে আনোয়ার পাশা সুদীপ্তের মাধ্যমে নিজেরই একটি সেলফ পোর্ট্রেট আঁকতে চেয়েছেন। সেই সুদীপ্ত শাহীনই যেন বাংলাদেশ, যে বাংলাদেশ বিপন্ন, ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও ভীত কিন্তু আশাহীন নয়। সুদীপ্ত শাহীন তার শ্রেণী অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধের মূলধারার সাথে মিশে গিয়েছিল। শাহীন মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেনি এ কথা যেমন সত্য ঠিক একই রকম এই শাহীনই মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী শক্তিরুপে নিয়োজিত থেকে নিজের বিবেকের কাছে পরিস্কার থেকেছেন। আত্মজৈবনিক ও উপন্যাসের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভিক কালের প্রামাণ্য দলিল উঠে এসেছে যা এ উপন্যাসকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছে।

মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উপর যে আলাদা ক্ষোভ ছিল পাক বাহিনীর তাও ফুটে উঠেছে উপন্যাসটিতে। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকাবাসীর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও জীবনযাত্রার একটি চিত্র ফুটে উঠেছে এতে। উপন্যাসের এক জায়গায় লিখলেন- 'নীলক্ষেতের পরিত্যক্ত রেললাইনের দুপাশে বাস করত হাজার হাজার গরীব মানুষ। সময়ে ঝড়ে বন্যায় গ্রাম বাংলার লাখ লাখ বাস্তহারা মানুষ শহরে এসেছে। তারাই এখানে এসে হয়েছে বস্তিবাসি। সেই গরীব মানুষের বস্তি পুড়িয়ে অশেষ বীরত্ব দেখিয়ে গিয়েছে পাক-ফৌজ।'

১৯৭১ সালে ২৫মার্চ রাতে কি হয়েছিল? কিসের প্রেক্ষিতে হয়েছিল? কেন হয়েছিল? কিভাবে হয়েছিল? সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় এ বইটিতে। এ উপন্যাসে শুধু একাত্তরে মানুষের আর্তনাদের চিত্র নয়, এতে রয়েছে দীপ্ত যৌবনের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। এখানেই এ উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্য। এ গল্পের নায়ক সুদীপ্ত যেন প্রতি বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংকল্প প্রত্যয়ের প্রতীক।

লেখক আনোয়ার পাশা এপ্রিলেই বুঝে গিয়েছিলেন স্বাধীনতা আসন্ন। তাই তিনি উপন্যাসের শেষ বাক্যে লেখেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অভয়বাণী- 'মা ভৈ'। এর মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সবার মধ্যে প্রেরণার আলো জ্বালতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবি হত্যার দিনে পাক হানাদার বাহিনী তার জীবনপ্রদীপের আলোই নিভিয়ে দেয়। কী বিস্ময়, চিরকালই নায়কেরা ধ্বংসের মুখে জীবিতদের আশার

বার্তা দিয়ে যান। যেমন দিয়েছেন প্রতিভাবান ব্রিটিশ কবি ও দার্শনিক ক্রিস্টোফার কডওয়েল। স্পেনের গৃহযুদ্ধে তিনি শহীদ হন। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বেশ কিছু উপন্যাস আছে কিন্তু রাইফেল রোটি আওরাত অনন্য। এ গল্পের শক্তি এতই তীব্রতর যে হাজার বছর পরেও বাঙালী জাতি সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ওঙ্কার

লেখকের নাম : আহমদ ছফা
প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৫
সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি, ২০১৪
প্রকাশক : স্টুডেন্ট ওয়েজ
পৃষ্ঠা : ১২৮
মূল্য : ১৫০ টাকা

বাংলা কথাসাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী ও সৃষ্টিশীল লেখক আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১)। তাঁর স্বাতন্ত্র্য 'ওঙ্কার' উপন্যাসটি আহমদ ছফার এক অনবদ্য রচনা। মূলত ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে লেখা উপন্যাসটি। মধ্যবিত্ত শৃংখলে আষ্টেপৃষ্ঠে বড় হওয়া ও ক্ষয়ে যাওয়া এক পারিবারিক বিত্ত-বৈভবের মধ্যে বেড়ে ওঠা আর দশটা মধ্যবিত্ত মানসিকতার মানুষের সাহসহীনতা ছিল কেন্দ্রীয় চরিত্রের মূল উপজীব্য বিষয়। নায়কের বাবা ব্রিটিশ আমলের এক তালুকদার। ব্রিটিশরা চলে যাওয়ায় তালুকদারদের সামাজিক মর্যাদা কমে যায়। গ্রামের মানুষ আগের মত তাদের আর মান্য করে না। এটা তালুকদার মেনে নিতে পারেন না। ফলে তিনি মামলা মোকাদ্দমার মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে ঝামেলায় ফেলেন। সবার সাথে পেরে উঠলেও পেরে ওঠেন নি আবু নাসের মোক্তারের সাথে। মুক্তার তালুকদারকে পরাজিত করে তার জমিজমা নিয়ে নেয় এবং কৌশলে তার বোবা মেয়েকে বিয়ে দেয় তালুকদারের ছেলের সাথে যে উপন্যাসের নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্র। আবু নাসেরের সঙ্গে সামরিক শাসক আইয়ুব খানের সম্পর্ক থাকা সে একধরনের ক্ষমতা লাভ করে। এই ক্ষমতাবলে সে জামাইকে চাকুরী এবং থাকার জন্য শহরে একটি বাড়ীর ব্যবস্থা

করে দেয়। নায়ক, তার বউ আর ছোট বোন মিলে তাদের শহরবাস শুরু হয়। প্রথম দিকে নায়ক বউয়ের সাথে স্বাভাবিক ব্যবহার করত না। অফিসে শেষে বাসায় এসে সারাদিন মনমরা হয়ে থাকত। একপর্যায়ে ছোট বোনের সাথে একটি দুরত্ব কমিয়ে আনার চেষ্টা করে। কারণ বউ বোবা বাসায় ছোট বোন ছাড়া আর কথা বলার মানুষ নেই। সে আগ্রহী হয়ে বোনকে গান শেখানোর ব্যবস্থা করে দেয়। একসময় বউয়ের সাথে স্বাভাবিক দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বউটিও বেশ প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। স্বচ্ছন্দে সংসারের সব কাজ আর স্বামীর সেবা করে। তারও গানের প্রতি আগ্রহ জন্মে। সে সবার অজান্তে গান গাওয়ার ও কথা বলার চেষ্টা করে। তার এই চেষ্টা ধীরে ধীরে প্রাণপন লড়াইয়ে পরিণত হয়। এই চেষ্টায় বাঁধা দিতে গেলে সে ক্ষেপে যায়। পাশাপাশি তৎকালীন আন্দোলন সংগ্রাম অর্থাৎ ৬৯ এর আন্দোলনও তাকে নাড়া দেয়। রাজপথ দিয়ে মিছিল গেলে নায়ক যেখানে দরজা জানালা বন্ধ করে সবকিছু থেকে পালিয়ে থাকতে চায় কিন্তু সে তখন দরজা জানালা খুলে দিয়ে মিছিলে শামিল হতে চায়। সবটুকু অনুভূতি দিয়ে মিছিলকে নিজের সত্তায় ধারণ করতে চায়, যেমন করে সূর্যমূখী সূর্য থেকে আলো গ্রহণ করে।

এই অব্যাহত চেষ্টার ফলে একসময় সে সফল হয়। উপন্যাসের একেবারে শেষের দিকে দেখা যায়; ১৯৬৯ সালে আসাদের মৃত্যুর পর জনতার মিছিলটি একেবারে বাড়ির সামনে এসে পড়ে। গোটা মিছিলটা যেন সারা বাংলাদেশের আগ্নেয় আত্মার জ্বালামুখ। সমস্ত বাংলাদেশের শিরা উপশিরায় এক প্রসব বেদনা ছাড়িয়ে পড়েছে। মানুষের বুকফাটা চিৎকারে ধ্বনিত হচ্ছে নবজন্মের আকুতি। চারপাশে সবকিছু প্রবল প্রাণাবেশে থর থর করে কাঁপছে। বাংলাদেশের আকাশ কাঁপছে, বাতাস কাঁপছে, নদী সমুদ্র পর্বত কাঁপছে, নর-নারীর হৃদয় কাঁপছে। মিছিলটি যখন বাড়ীর সামনে দিয়ে যায় তখন সে মিছিলের সাথে সত্যিই বলে ওঠে 'বাঙলা'। বলার সাথে সাথে তার গলা থেকে গলগল করে রক্ত বেড়িয়ে আসে। তখন তার স্বামী ভাবে কোন রক্ত বেশি লাল আসাদের? না তার বউয়ের?। এখানেই শেষ হয় উপন্যাস।

এ উপন্যাসে বোবা মেয়ের আকস্মিক সবাক হয়ে ওঠার ঘটনা চমকে দেয় সবাইকে। আর এই ঘটনার সূত্র ধরে উপন্যাসটির কাহিনী গতি লাভ করে। ন্যারেশনের মাধ্যমে গল্প এগিয়ে চলে। সেই বোবা মেয়ে সবাক হওয়ার ঘটনা ষাটের দশকের বাঙালি জাতির সত্তার জাগরণের ইঙ্গিতকে সুস্পষ্ট করে। ওঙ্কার উপন্যাসে সামরিক শাসন পীড়িত, অবরুদ্ধ জাতীয় অস্তিত্বের প্রতীক হয়ে

উঠেছে সেই বোবা মেয়ে যে কিনা সুবিধাবাদী প্রতারক ষড়যন্ত্রপরায়ণ ও পাকিস্তানী আদর্শের ধারক বাহক আবু নাসের মুক্তারের মেয়ে। তার এই উচ্চারণের মধ্য দিয়ে যেন জন্ম হয় এক নবজাতকের। নবজাতকটি হল স্বাধীন বাংলাদেশ।

আহমদ ছফা প্রান্তিক চরিত্রের দৃষ্টিকোন থেকে নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন দেশ বিভাগের ও কালের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন এবং অনাড়ম্বর ও বাহুল্যবর্জিত লেখনী ব্যবহার করে ইঙ্গিতময় বর্ণনায় উপন্যাসের কাহিনী ব্যক্ত করেছেন। ব্যক্ত করেছেন ৬৯-এর প্রেক্ষিতে স্বাধীন বাংলাদেশের ইঙ্গিত। বাংলা সাহিত্যের প্রজ্ঞাময় লেখক আহমদ ছফার এ শিল্পসফল উপন্যাসটি বাংলা কথসাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন।

হাঙ্গর নদী গ্রেনেড

লেখকের নাম : সেলিনা হোসেন
প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৬
সংস্করণ : জুন, ২০০৩
প্রকাশক : অনন্যা প্রকাশ
পৃষ্ঠা : ১১২
মূল্য : ৮০ টাকা

বর্তমান বাংলা কথাসাহিত্যে একজন সুপরিচিত সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন (১৯৪৭-)। একবিংশ শতব্দীর বদলে যাওয়া বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতা যেসব সাহিত্যিকের লেখায় গভীরভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন তাঁদেরই একজন। প্রায় চার দশক ধরে সাহিত্যচর্চার সাথে জড়িত এ কথাসাহিত্যিকের রচনার ভান্ডার বিশাল। তিনি লেখায় উপজীব্য করেছেন প্রকৃতির দ্বারা বিপন্ন গ্রামীণ উপকূলীয় জনজীবন মুক্তি সংগ্রাম, দেশভাগ এসবের মধ্যে মধ্যবিত্তের আত্মসংকট আর ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সমকালীন মানুষের রাষ্ট্রিক-সামাজিক সংকটকে। রূপান্তরিত রাষ্ট্রিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের সংকট ও সংগ্রামকে তুলে ধরেছেন গভীর মমতায়। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকালের কাহিনী নিয়ে রচিত 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসটি সেলিনা হোসেনের এক অসাধারণ রচনা। এ উপন্যাসে তিনি মুক্তিযুদ্ধকালে গ্রামীণ জীবনের ঘটনা প্রবাহের সুনিপুণ ছবি তুলে ধরেছেন।

বিস্তৃত পটভূমিতে লেখা হাঙর নদী গ্রেনেড উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনযাত্রা, নিম্নমধ্যবিত্ত ও মানুষের পরিণতি ও আকাঙক্ষা, পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অত্যাচার, রাজাকার বাহিনীর অপতৎপরতা অতি সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে 'বুড়ি' চরিত্রটি। হলদি গাঁর মেয়ে বুড়ি। বুড়ি সবার চেয়ে একটু আলাদা। সে চায় হলদি গায়ের বৃত্ত থেকে বের হতে, নতুন কিছু দেখতে। কিন্তু নিন্তাতই অল্প বয়সে বিয়ে হয় যায় বিপত্নীক চাচাত ভাই গফুরের সাথে। গফুরের সাথে বিয়ে হওয়ার সে রাতারাতি মা হয়ে যায় গফুরের আগের ঘরের দুই ছেলে সলীম ও কলীমের। তার সংসার ভালই চলছিল। কিছুদিন পর তার নিজেরও একটি ছেলে সন্তান হয়। কিন্তু সে ছেলে আর দশটা শিশুর মত নয়। সে বাক ও শ্রুতিপ্রতিবন্ধী। তার নাম রইস। এরই মধ্যে মারা যায় গফুর। ছেলেরা বড় হয়, বুড়ি সলীমকে বিয়ে করায়, কালিমের বিয়ে পাকিপাকি করার সময় শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। বন্ধ হয়ে যায় বিয়ের আলোচনা। যুদ্ধের ঢেউ হলদিগাঁর গায়েও লাগে। লন্ডভন্ড হয়ে যায় বুড়ির সাজানো গোছানো সংসার। সলীম যায় যুদ্ধে, কলীমকে পাকিস্তানী সৈন্য ও দোসররা চোখের সামনে নির্মমভাবে খুন করে। এমন পরিস্থিতিতে একদিন হাফেজ ও কাদের দুই মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করতে করতে শত্রুপক্ষের চোখ ফাঁকি দিয়ে আশ্রয় নেয় বুড়ির ঘরে। পিছু পিছু শত্রুরাও আসে বাড়িতে। সেই সময়ই সংঘঠিত হয় ইতিহাসের ভিন্ন এক মাহেন্দ্রক্ষণ। দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় একজন মা মুক্তিযোদ্ধাদের বাঁচাতে নিজের সন্তানকে তুলে দেয় বন্দুকে নলের মুখে। সন্তানের নাম রইস আর মায়ের নাম বুড়ি।

উপন্যাসের এই বুড়ি চরিত্রটির ভেতর বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বাদ নানামুখি ক্রিয়া তৈরি করে। হলদী গায়ের প্রতীকী অবস্থানও উপন্যাসে স্বার্থকভাবে উঠে এসেছে। এই উপন্যাসের সবকটি চরিত্রের উৎস গ্রাম হলেও কাহিনী বর্ণনায় ঔপন্যাসিকের গভীর জীবনোপব্ধির প্রমাণ মেলে। মূলত বুড়ি চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখিকা অবরুদ্ধ দেশের মুক্তিকামী মানুষের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরেছেন। হাঙ্গর নদী গ্রেনেড এক অসাধারণ আখ্যান। বুড়ি সেই আখ্যানের ইতিহাস কন্যা আর হলদি গাঁ বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেকেই উপন্যাস রচনা করেছেন। তবে সেলিনা হোসেনই প্রথম একজন নারীকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতার যুদ্ধে সাধারণ মানুষের সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরেছেন। স্বাধীন দেশের আকাঙ্ক্ষায় 'বুড়ি' চরিত্রের ত্যাগ ও সাহসীকতা উল্লেখের মধ্য দিয়ে সারা বাংলাদেশের সকল মায়েদের ত্যাগ ও সাহসীকতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কত মা ছেলেকে যুদ্ধে পাঠিয়েছে, কত মা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে, কত মা দেশের স্বার্থে নানাভাবে নিজের স্বার্থ বিলিয়ে দিয়েছে। সব মায়ের সকল স্বার্থ ত্যাগকে ঔপন্যাসিক প্রতীকায়িত করেছেন বুড়ি চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

মূলত এটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত উপন্যাস। রাজশাহীতে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এক মহিলার বাসায় দুই মুক্তিযোদ্ধা আশ্রয় নেয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পাক হানাদার বাহিনী ঐ মহিলার বাড়ি হানা দেয়। মহিলা দুই মুক্তিযোদ্ধকে বাঁচাতে তার নিজের প্রতিবন্ধী ছেলে 'মুকুট'কে পাক হানাদার বাহিনীর কাছে তুলে দেয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার দুদিন পর সেলিনা হোসেন আব্দুল হাকিম নামের শিক্ষক ও সাংবাদিকের কাছে এ ঘটনা শোনেন। তারপরই এ কাহিনী নিয়ে একটি উপন্যাস লিখার সিদ্ধান্ত নেন।

ঔপন্যাসিক সহজ সরল বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে উপন্যাসটি উপস্থাপন করেছেন। চরিত্র প্রকাশের প্রয়োজনে সংলাপ নির্মাণে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। লেখিকার অনায়াসলব্ধ লেখনীর কারণে মুক্তিযুদ্ধের এক ব্যতিক্রমী গল্প হিসেবে উপন্যাসটি আজও ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়। চাষী নজরুল ইসলাম একই নামে উপন্যাসটির চলচ্চিত্রায়ণ করেন। চলচিত্রটিও ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

নিষিদ্ধ লোবান

লেখকের নাম : সৈয়দ শামসুল হক
প্রথম প্রকাশ : ১৯৮১
সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি, ২০০৯
প্রকাশক : অনন্যা
পৃষ্ঠা : ৭১
মূল্য : ১০০ টাকা

একবিংশ শতকের আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-)। অনেকের মতানুসারে তিনি সব্যসাচী লেখক হিসেবে পরিচিত। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে রচিত বাংলা উপন্যাসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সৈয়দ শামসুল হকের 'নিষিদ্ধ লোবান'। উপন্যাসে লেখক মুক্তিযুদ্ধের বিশৃঙ্খল পটভূমিতে বিলকিস নামের এক নারীর সংগ্রামের কাহিনীকে কেন্দ্র করে দেশের সর্বস্তরের মানুষের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের খণ্ডচিত্র তুলে ধরেছেন।

এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বিলকিস। শিক্ষিত-সংস্কৃতিমনা-বলিষ্ঠ চিত্তের অধিকারী বিলকিসের স্বামী, প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক হাসান ১৯৭১ সালের ২৫মার্চ রাতে নিখোঁজ হন। হাসানের সান্নিধ্যে বাঙালীর স্বাধীনতায় উজ্জীবিত বিলকিস

অসুস্থ শ্বাশুড়ীর দেখাশুনা, নিজের ব্যাংকের চাকুরী, নিখোঁজ হাসানের খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি ধীরে ধীরে ঢাকার গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে নিজেকে জড়িয়ে নেয়। তার মত আরো অনেক নারী চাকুরী বা নিজ সামাজিক অবস্থানের ছত্রছায়ায় গেরিলা যুদ্ধের নানা সাংগঠনিক যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে নিয়োজিত থেকে গেরিলা যুদ্ধকে সম্ভব করে তুলেছিলেন। এ সময় হাসানের দুধভাই তসলিম সর্দার আর সে সময়ের কিংবদন্তি সুরকার আলতাফ মাহমুদ অভিভাবকের মতো স্নেহে-পরামর্শে বিলকিসকে ছায়া দেন। পাকিস্তানী বর্বরতা, বাঙ্গালীর প্রতিরোধ আর স্বাধীনতার দাবী দেশে বিদেশে ছড়িয়ে দিতে সশস্ত্র যুদ্ধের পাশাপাশি বিলকিস সহযোদ্ধাদের সাথে একটি প্রত্রিকার কাজেও জড়িয়ে যায়।

সময়ের আবর্তে ১৯৭১-এর আগষ্ট মাসের শেষ দিকে একটি বড় অপারেশনের পর ঘটনা পরিক্রমায় বিলকিসকে ঢাকা ছাড়তে হয়। তসলিম সর্দার নিহত হন, আলতাফ মাহমুদ মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র রাখার দায়ে পাকিস্তানী আর্মি কর্তৃক ধৃত হন। বিলকিস একাকী নিজগ্রাম রংপুরের জলেশ্বরী যাবার জন্য ট্রেনে পাড়ি জমায়। কিন্তু তারই ছোট ভাই খোকনের দল এদিকে একটি রেল ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়ার তার রেল যাত্রা ব্যাহত হয়। দৃঢ়চিত্ত বিলকিস পাঁচ মাইল পথ হেঁটেই এগিয়ে চলে বাড়ীর পথে। খোকন বাহিনীর এক তরুণ মুক্তিযোদ্ধা সিরাজ বিলকিসের যাত্রাসঙ্গী হয়। বাড়ি গিয়ে নানা ঘটনার পাশাপাশি নিজের বাড়ী লুট হওয়া ও তার মামার উপর মিলিটারি-রাজাকারদের নির্যাতন দেখে শিউরে উঠে। অতঃপর যুদ্ধের ডামাডোলে জীবনের সকল সূত্র হারানো বিলকিস একমাত্র ভাই খোকনকে দেখবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু দূর্ভাগ্য তার, এরই মধ্যে মিলিটারি-বিহারীরা হত্যা করে খোকনকে। তার সাথে আরো অনেক লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। মিলিটারিরা ঘোষণা দেয় কেউ তাদের দাফন করতে পারবে না। তখন বিলকিস প্রতিজ্ঞা করে ভাইয়ের লাশ দাফন করার। উপন্যাসের শেষ দিকে খোকনের লাশ দাফন করতে গিয়ে পাকিস্তানী মেজরের হাতে ধরা পরে বিলকিস আর সিরাজ। তখনই জানা যায় সিরাজ আসলে হিন্দু। তার প্রকৃত নাম প্রদীপ। যাই হোক শেষ পর্যন্ত বিলকিস আত্মহুতি দেয়। তবে আত্মাহুতি দেয় বীরের মত। গ্রেনেড হামলায় নিজের সাথে উড়িয়ে দেয় একটি গোটা মিলিটারী ক্যাম্প।

উপন্যাসটিতে দেখানো হয়েছে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশে বেশির ভাগ মানুষেরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান ছিল। তখন কোন জাত পাত ছিল না,

হিন্দু-মুসলিম ছিল না। সবাই সবাইকে সাহায্য করেছে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে। অনেক হিন্দু পরিবাকে আশ্রয় দিয়েছে কট্টর মুসলিম পরিবার। পাকিস্তানী হানাদাররা কতটা ভয়ংকর ছিল এবং ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি তাদের মনোভাব কেমন ছিল তার পরিস্কার বর্ণনা আছে উপন্যাসটিতে। মুসলমান নারীরাও ছিল তাদের কাছে ভোগেরপন্য। পাকিস্তানিরা বলতো তোমাদের রক্ত শুদ্ধ করে দিয়ে যাব, তোমাদের গর্ভে খাঁটি পাকিস্তানী রেখে যাব।

সবমিলিয়ে বলা যায় 'নিষিদ্ধ লোবান' উপন্যাসে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নারী ও হিন্দু ধর্মালম্বীদের অবস্থান ও পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। সাহিত্যের মাধ্যমে যারা একাত্তরের ইতিহাসকে জানতে চায় তাদের জন্য এ উপন্যাসটি অবশ্যপাঠ্য।

প্রদোষে প্রাকৃতজন

লেখকের নাম : শওকত আলী (১৯৩৬-)
প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৪
সংস্করণ : ৮ম, ২০০৯
প্রকাশক : ইউপিএল
পৃষ্ঠা : ১৯৭
মূল্য : ২২০ টাকা

দেশবিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার কথাসাহিত্যকে যারা সমৃদ্ধ করেছেন তদের মধ্যে অন্যতম কথাসাহিত্যিক শওকত আলী। ষাটের দশক থেকে সাহিত্যাঙ্গনে তার বিচরণ। বর্তমান কথাসাহিত্যে তিনি এক প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। সাহিত্য চর্চায় বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন ইতিহাস, সামাজিক রূপান্তর, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক আবহে ব্যক্তি এবং সামষ্টিক মানুষের জীবন ও বিষয় আশ্রয়কে। এরূপ বিষয় আশ্রিত শওকত আলীর এক ঐতিহাসিক উপন্যাস 'প্রদোষে প্রাকৃতজন'। উপন্যাসের কাল পটভূমি হিসেবে তিনি ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালকে বেছে নিয়েছেন।

উপন্যাসের পটভূমি দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগের বাংলা। ১২০৪ সালে তুর্কি সেনাপতি বখতিয়ার খিলজি সেন বংশের শেষ শাসক রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করেন। ঐতিহাসিক এই

সময়ের পটভূমিতে উপন্যাসটি পরিকল্পিত হয়েছে। প্রদোষ হল আলো এবং আধাঁরের মধ্যবর্তী সময়। অর্থাৎ সকাল বা সন্ধ্যা। লক্ষণ সেনের বিদায় অনেকের কাছে প্রদোষ বা সন্ধ্যাকাল। আর বখতিয়ার খিলজির আগমণ তাদের কাছে প্রদোষ বা সকাল। আর প্রাকৃতজন অর্থ প্রান্তে বাস করে যারা। অর্থাৎ এ প্রদোষে প্রান্তের মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও অবস্থা নিয়ে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। প্রাচীন বাংলার কোন এক গ্রামীণ প্রান্তরে সাধারণ মানুষ কি ভাবছে সম্ভ্যব্য আক্রমণ নিয়ে, তারই চিত্র তুলে ধরেছেন শওকত আলী তার এ উপন্যাসে।

বর্তমান বাংলাদেশের দিনাজপুরের পুনর্ভবা, আত্রাই বা বগুড়ার করতোয়া নদীর পাড়ের গ্রাম, গ্রামের মানুষ, তাদের শঙ্কা, স্বপ্ন, কাপুরুষতা, প্রতিরোধ এগুলোই হল উপন্যাসের মূল উপজীব্য। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলোতে ইতিহাসের একটি প্রধান চরিত্র থাকে যাদের কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়। কিন্তু প্রদোষে প্রাকৃত উপন্যাসে তেমন কোন প্রধান চরিত্র নেই। লক্ষণ সেনের কথা দু'এক বার উল্লেখ আছে। এছাড়া উপন্যাসের শ্যামাঙ্গ, লীলাবতী, মিত্রানন্দ, বসন্তদাস, মায়াবতী এরা কেউ ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। প্রাকৃতজন অর্থাৎ যারা প্রকৃতির কাছাকাছি বসবাস করে তারাই এ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা। তারা গ্রামের ক্ষেতকর, মৃৎশিল্পী, গ্রামীণ বণিক, ভিক্ষু, মন্দিরের দাসী, সাদামাটা গৃহিনী ইত্যাদি।

গ্রামের মানুষের মুখে মুখে রটে গেছে সেনরাজ শাসন থেকে স্থলিত হয়ে যাচ্ছে দেশ, তুর্কী আক্রমণ আসন্ন। গুড়িয়ে যাবে হিন্দু সেন সাম্রাজ্য। প্রজারা অনেকেই এতে বেশ খুশি, উল্লসিত। অন্তত তারা সামন্ত মহাসামন্তের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবে। আবার এটিও নিশ্চিত নয় নতুন শাসক কেমন হবে। তবে তারা এটুকু দেখেছে যবনদের (মুসলমান) ধর্মে ও ধর্মীয় আচারাধি অনুষ্ঠানে জাতপাতের কোন কড়াকড়ি নেই।

ইতিহাসের সেই প্রদোষকালের জটিল আবর্তে ঘূর্ণ্যমান কয়েকজন প্রাকৃত নরনারীর কাহিনী বিবৃত হয়েছে এই উপন্যাসে। ইতিহাসে তাদের নাম নেই। হয়তো অন্যনামে তারা বাস করেছে সেই কালে, নয়তো অন্য কালেও। মৃৎশিল্পী শ্যামাঙ্গের যত্নকৃত শিল্প রচনায় কেন ছেদ পড়ে, কিসের অন্বেষণে তাকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে হয়? স্বামী পরিত্যক্ত লীলাবতী কি চায়? কেন পায় না? মায়বতীর কোমল বাহুবন্ধন ছিন্ন করে বসন্ত দাস কেন মৃত্রানন্দের সঙ্গী হয়। মানুষকে স্বপরিচয়ে উঠে দাঁড়াতে বলে মৃত্রানন্দ। নতজানু দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে বলে এর বেশি সে জানে না। জানবার আবশ্যকতাও বোধ করে না।

বসন্ত দাসও চায় প্রচলিত ব্যবস্থা বিধ্বস্ত করতে? কিন্তু আরো জানতে চায় যে, তার পরিবর্তে কি পাবে সকলে? এসব প্রশ্নের মীমাংসা হরার আগেই ইতিহাসের ঝঞ্ঝা এসে তাদের সমূলে উৎপাটিত করে। তাদের এই সব জিজ্ঞাসা আর ভালবাসা, স্বপ্ন আর প্রয়াসের সারাৎসার তারা সপে দিয়ে যায় উত্তরসূরীদের হাতে।

যত্নের সঙ্গে লিখেছেন শওকত আলী তাদের কথা, সেই সময়ের কথা। এই উপন্যাসে গবেষণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দরদ, তত্ত্বের সঙ্গে মিলেছে অন্তর্দৃষ্টি, মনোহর ভঙ্গির সঙ্গে মিশেছে অনুপম ভাষা। এ উপন্যাসের সময়কাল ও চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে এর উপযোগী ভাষা ব্যবহার করেছেন। লেখকের চিত্রাত্মক বর্ণনায় উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে জীবন্ত। কাহিনী বিন্যাস ও গঠনশৈলী সবদিক থেকে উপন্যাসটি বাংলা উপন্যাস ধারায় একটি অনন্য সংযোজন। শিকড় সন্ধানী লেখক শওকত আলী প্রদোষে প্রাকৃতজন এর মত উপন্যাস লিখে সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা সাহিত্যকে।

পদ্মার পলিদ্বীপ

লেখকের নাম : আবু ইসহাক
প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৬
সংস্করণ : ৫ম, জুন ২০১২
প্রকাশক : নওরোজ সাহিত্য সম্ভার
পৃষ্ঠা : ২২৪
মূল্য : ২৫০ টাকা

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০২)। স্বল্প পরিসরে হলেও কথাসাহিত্যের প্রায় সব শাখায় তিনি বিচরণ করেছেন। তার রচনার পটভূমি হিসেবে এসেছে বিশ শতকের মানুষের জীবনের আত্মিক, মানবিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট। তাঁর লেখার প্রাণ ছিল মাটি ও মানুষ। বাংলাদেশ একটি নদীবেষ্টিত ভূখন্ড হলেও নদীকেন্দ্রিক উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়। হাতেগোনা কয়েকটি উপন্যাসের মধ্যে আবু ইসহাকের 'পদ্মার পলিদ্বীপ' একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

প্রায় ২৫ বছর ধরে তিনি উপন্যাসটি লিখেছেন। ১৯৬০ সালে শুরু করে ১৯৮৫ সালে শেষ করেন। উপন্যাসে প্রথম ষোলটি অধ্যায় বাংলা একাডেমী প্রকাশিত উত্তরাধিকার পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তখন এর নাম ছিল 'মৃখর মাটি'। এর অনেক পরে আবু ইসহাক উপন্যাসটি ৩২টি অধ্যায়ে সমাপ্ত করেন এবং এর নাম দেন 'পদ্মার পলিদ্বীপ'। পদ্মা নদীতে জেগে উঠা পলিমাটির দ্বীপ অর্থাৎ চরের কাহিনী এটি। নদীর চরকে ঘিরে মানুষের যে কার্যক্রম তা-ই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য। পদ্মার তীরবর্তী অঞ্চল নিয়ে রচিত এটি একটি আঞ্চলিক উপন্যাস।

পদ্মার বুকে জেগে উঠা চরের মতই দ্বীপাঞ্চলের মানুষের অনিশ্চিত জীবনের গল্প ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মানুষ, মানুষের সমাজ, আশা আকাঙক্ষা, আনন্দ-বেদনা, হারানো-প্রাপ্তি, প্রেম-বিরহ, শত্রুতা-মিত্রতা, মানুষের জীবনের সঙ্গে যা কিছু সম্পৃক্ত সবই। উপন্যাসটি শুরু হয় পদ্মার বুকে জেগে উঠা 'লটাবনিয়া' চর দখল নিয়ে এরফান মাতব্বর ও চেরাগ আলী সরদারের দ্বন্দ্বের ঘটনা দিয়ে। এতে নিহত হয় এরফান মাতব্বরের জোয়ান ছেলে। তখন থেকে এ চরের নাম হয় 'খুনের চর'। চরটি এক সময় পদ্মার করালগ্রাসে বিলীন হয়ে যায়। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ফজল, এরফান মাতব্বরের ছেলে, অর্ধশিক্ষিত যুবক। ফজল একদিন মাছ ধরতে গিয়ে দেখে তাদের পুরোনো খুনের চর আবার জেগে উঠেছে। সে তার বাবা এরফান মাতব্বরকে খবর দেয়। কোলশরিকদের নিয়ে মাতব্বর চরটি দখল করে। কিন্তু উপন্যাসের আরেক চরিত্র জঙ্গরুল্লাও চর দখল করার চিন্তা করে। সে পুলিশকে ঘুষ দিয়ে চরের পাশে একটি মিথ্যা ডাকাতি মামলা দেয় ফজলদের বিরুদ্ধে। ফজলরা পালিয়ে গেলে জোতদার জঙ্গরুল্লা চরটি দখল করে নেয়।

উপন্যাসটিতে চর দখল পুর্নদখলের এই সংগ্রাম কাহিনীর সমান্তরালে কয়েকটি পার্শ্বকাহিনী রয়েছে। যেমন ফজল, তার বর্তমান স্ত্রী রূপজান এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী জরিনার ত্রিভুজ সম্পর্কের উপকাহিনী এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় অংশই। প্রায় সমবয়সী ফজল জরিনার বাল্য বিবাহ হয়। কিন্তু দাম্পত্য জীবনের শুরুতেই ছেলের শিক্ষাজীবন বিঘ্নিত হবে এই আশংকায় এরফান মাতব্বর জোরপূর্বক বিবাহবিচ্ছেদ ঘটায়। জরিনার বিয়ে হয় এক পেশাদার চোরের সাথে। পরে ফজল বিয়ে করে আরশাদ মোল্লার মেয়ে রূপজানকে। পাবিবারিক দ্বন্দ্বের ফজলে এই বিয়েও হুমকির সম্মুখীন হয়। আরশাদ মোল্লা তার মেয়ে রূপজানকে আটকে রেখে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে চায়। এরই মধ্যে জরিনার সঙ্গে ফজলের সাক্ষাত ঘটে এবং তাদের মধ্যে অবৈধ সম্পর্কও স্থাপিত হয়। শেষ পর্যন্ত ফজল যেমন চর পুনর্দখল করে, তেমনি রূপজানকেও উদ্ধার করে। একটি সফল সমাপ্তির মধ্য দিয়ে শেষ হয় উপন্যাসের কাহিনীর।

উপন্যাসটি আয়তনে বেশ বড়। ঘটনার ঘনঘটা ও নাটকীয়তা, লোকজ জীবনের সংস্কৃতি ও নানা অনুষঙ্গ, কালিক রাজনীতি ও অর্থনৈতিক অবস্থার ইঙ্গিত, লোকজ গান-প্রবচন, আঞ্চলিক ভাষা সবই আছে এ উপন্যাসে।

চরাঞ্চলের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ঘনিষ্ট বর্ণনার পাশাপাশি সমকালীন রাজনীতি ও অর্থনীতির নিগূঢ় চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। আবু ইসহাক যখন এ উপন্যাসটি লিখছেন ততদিনে মার্কিন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে ডালপালা গজিয়েছে। তিনি জানেন সাম্রাজ্যবাদিরা নব নব পন্থায় সাম্রাজ্য বিস্তারের পায়তারা করে। উপন্যাসের নায়ক ফজল হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের প্রতিনিধি। আর জঙ্গরুল্লা সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি। ফজলদের খুনের দ্বীপ থেকে মাছ ধরে দু পয়সা আয় করা যায়। একথা যখন জঙ্গরুল্লারা জানল তখনই নিরীহ মানুষ ফজলদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা, পুলিশী হয়রানী করে তাদের দু পয়সা রোজগারের জায়গা দ্বীপটি দখল করে নেয়। পদ্মাপারের মানুষের ভাষা দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের অক্টোপাশি চেহারাকেও উম্মোচিত করেছেন।

ঔপন্যাসিক নান্দনিক শৈল্পিকতা ও নিবিড় অন্তর্দৃষ্টির সমন্বয়ে পদ্মাপারের জনজীবনকে চিত্রিত করেছেন। ফলে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে চরাঞ্চলের মানুষের জীবনপ্রবাহের বিশ্বস্ত নথিপত্র। আর বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের আঞ্চলিক ধারাকে করেছেন সমৃদ্ধ।

চিলে কোঠার সেপাই

লেখকের নাম : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৬
সংস্করণ : ৬ষ্ঠ, ২০১২
প্রকাশক : দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
পৃষ্ঠা : ৩০৪
মূল্য : ৩৩০ টাকা

বাংলা কথাসাহিত্যের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে যখন তিনি লেখালেখি শুরু করেন তখন বাংলা কথাসাহিত্য ভালভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কিন্তু আখতারুজ্জামান এই প্রতিষ্ঠিত তথা প্রথাগত রীতি অনুসরণ না করে নিজস্ব ঢঙে লেখালেখি করেছেন। তিনিই বাংলাদেশের প্রথম কথাশিল্পী রাজনৈতিক পটভূমির রচনায় যিনি উপজীব্য করেছেন বৃহত্তর জনমানুষের জীবন। ইতিহাসমোথিত সময়,

মানুষ আর সমাজকে উপজীব্য করেছেন তাঁর উপন্যাসে। তিনি সমাজের ভেতরকার স্পন্দনসহ বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এ সব কিছুর সমন্বয়ে রচিত 'চিলে কোঠার সেপাই' (১৯৮৬) উপন্যাস।

আখাতারুজ্জামান ইলিয়াস ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে চিলে কোঠার সেপাই উপন্যাসটি রচনা করেছেন। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ববর্তী রূপটি ফুটে উঠেছে। যেখানে ব্যক্তি মানুষকে ছাপিয়ে ইতিহাস ও জনপদই নায়ক হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র উসমান। যার ছোটবেলায় ডাকনাম ছিল রঞ্জু। আবার সে যেখানে থাকে সেখানকার অন্য এক ভাড়াটিয়া পরিবারের কিশোর ছেলের নামও রঞ্জু। এই রঞ্জুর মধ্যে সে আত্মপ্রতিকৃতি আবিষ্কার করে ও অতীত কল্পনা করে। অন্যান্য প্রধান চরিত্র আনোয়ার ও হাড্ডি খিজির। উসমানের পিতার মৃত্যুর স্বপ্নদৃশ্য দিয়ে উপন্যাসের শুরু। এই উসমান দেশবিভাগের সময় উদ্বাস্তু হয়ে ঢাকায় আসে। সে এতোটাই ছিন্নমূল যে ঢাকা শহরের এক ঘিঞ্জি গলির চিলেকোঠায় তাকে বাস করতে হয়েছে। সে এক অফিসের জুনিয়র কর্মকর্তা। তার বন্ধু বাম রাজনীতির কর্মী আনোয়ার এবং ডানপন্থি আলতাফ। তাদের সাথে সে আইয়ুব বিরোধী মিছিলে যায়, মিটিংয়ে যায়, আলোচনায় বসে। স্বদেশী আন্দোলনের সাথে সে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ফলে রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে শ্রমিক, রিক্সাওয়ালার সাথেও তার যোগাযোগ রয়েছে। কোন বাড়ির চিলেকোঠায় বসবাস করেও স্বাধীনতার আন্দোলনের সাথে যুক্ত রয়েছে উসমান। আবার সবকিছুতে থেকেও যেন কোন কিছুতে নেই। সে যেন চিলেকোঠার রুমে বন্দী। উপন্যাসের শেষ অর্ধাংশে দেখা যায় উসমান ইনসমনিয়ায় আক্রান্ত। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। সে ভুলভাল বলে ও অসঙ্গত চিন্তা করে। একপর্যায়ে সে রঞ্জুর ঠোঁটে চুমো খেতে গিয়ে কামড়ে দেয়। এর মধ্য দিয়ে লেখক সমকামীতা নয় উসমানের তথা বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের আত্মপ্রেমকে তুলে ধরেছেন।

উসমানের এই আত্মপ্রেম, ইনসমনিয়ায় আক্রান্ত হওয়া এবং চিলেকোঠায় বন্দী থাকা- এসবের মধ্য দিয়ে আন্দোলন পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্তের উদাসীনতা ও আন্দোলন-বিপ্লবে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের অভাবকেই তুলে ধরেছেন। বিপরীতে দেখিয়েছেন একেবারে প্রান্তের মানুষ হাড্ডিখিজির, উসমানের বাড়ীওয়ালার কাজের লোক। সে কখনো ট্যাক্সি বা রিক্সা চালায় কখনো মালিকের হুকুম তালিম করে। এই হাড্ডিখিজির জীবন-সংসার, ছেলে-বউয়ের

কথা চিন্তা না করে আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করে। যেকোন ডাকে সাড়া দেয় এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়।

এভাবে উসমানকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট কাহিনীগুলোই এ উপন্যাসে আলোচিত হয়েছে। যেমন তার বন্ধু বাম রাজনীতির সাথে জড়িত আনোয়ার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য গ্রামে যায়। তার এই যাওয়াকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ জনজীবনের বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা রয়েছে এবং শহরের উত্তাল রাজনীতির ঢেউ গ্রামীণ জীবনকে কীভাবে দোলা দেয় তা সহজভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন দক্ষতার সাথে। এ বর্ণনায় আমরা উত্তরবঙ্গের তৎকালীন সমাজ পরিস্থিতির পরিচয় পাই। পাশাপাশি পরিচয় পাই গ্রামের সাহসী চরিত্র ।

আখতারুজ্জামানের লেখার প্রধান শক্তি হল ভাষা। বিষয়ের প্রেক্ষিতে ও চরিত্র ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজনে তাঁর ভাষা হয়ে উঠেছে অনন্য। আখতারুজ্জামান মানুষকে ভালবাসতেন যা তার লেখায় স্পষ্ট। ব্যক্তির জীবন পরিসরকে কিংবদন্তী, ইতিহাস ও সমকালের এমন এক পটে মেলে ধরেছেন যে তাঁর প্রতিটি লেখাই হয়ে উঠেছে আমাদের জীবনের অস্তিত্বগাঁথা, একই সাথে বর্তমান ও ভবিষ্যতের মহাকাব্যিক আলোচনা।

খোয়াবনামা

লেখকের নাম : আখতারুজ্জামান ইলিয়াছ
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৯৬
সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৫
প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স
পৃষ্ঠা : ৩৫২
মূল্য : ৪০০ টাকা

বাংলা কথাসাহিত্যের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে যখন তিনি লেখালেখি শুরু করেন তখন বাংলা কথাসাহিত্য ভালভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কিন্তু আখতারুজ্জামান এই প্রতিষ্ঠিত তথা প্রথাগত রীতি অনুসরণ না করে নিজস্ব ঢঙে লেখালেখি করেছেন। তিনিই বাংলাদেশের প্রথম কথাশিল্পী রাজনৈতিক পটভূমির রচনায় যিনি উপজীব্য করেছেন বৃহত্তর জনমানুষের

জীবন। তার উপন্যাসে ব্যক্তি মানুষ নয়, ইতিহাস ও জনপদই পেয়েছে নায়কত্বের মর্যাদা। এই জনপদ ও ইতিহাসের মিশ্রণে লিখেছেন 'খোয়াবনামা' (১৯৯৬) উপন্যাস।

বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে যে সকল সৃষ্টি, তাঁর মধ্যে অন্যতম আখতারুজ্জমান ইলিয়াসের খোয়াবনামা। ১৯৯৪ সালে কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন আয়োজিত সাহিত্য সভায় বাংলা সাহিত্যের ভাষা নিয়ে একটি বিতর্কের সূত্রপাত হয়। সেখানকার বাঙালি সাহিত্যিক সম্প্রদায় ও বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক লেখক-কবি দুই বাংলার ভাষারীতির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকা উচিত নয় বলে মত প্রকাশ করেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এর বিপক্ষে মত দেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বক্তব্য নিয়ে তুমুল বিতর্কের সূত্রপাত হয়। এ ঘটনার পর সেখানকার একটি প্রভাবশালী প্রত্রিকা সেই রাতে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে বর্জন করে সবাইকে গ্রান্ড হোটেলে ডিনারের নিমন্ত্রণ করে। এ ঘটনার আকস্মিকতায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তার বিখ্যাত উপন্যাস 'খোয়াবনামা' লেখার সিদ্ধান্ত নেন।

আঞ্চলিক ভাষায় চমৎকার উপন্যাসের সার্থক উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াছ 'খোয়াবনামা' উপন্যাসের মাধ্যমে। কাৎলাহার বিলের দু'ধারের চাষী-মাঝিদের জীবনচরিত লেখকের শক্তিশালী কলমে উপন্যাস রূপ ধারণ করেছে খোয়াবনামায়। আর সেই জীবনের রূপ-রস-গন্ধ উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান। তমিজ, তমিজের বাপ, ফকিরের নাতনী কুলসুম, চাষীর মেয়ে ফুলজান, বৈকুণ্ঠ- পূর্ব বাংলার এমন সব প্রান্তিক চরিত্রের সমাহার রয়েছে উপন্যাসে। সাথে আরো রয়েছে শরাফত মন্ডল আর কালাম মাঝির মত গ্রামের কিছু ক্ষমতাবান মানুষ যাদের উত্তরপ্রজন্ম শিক্ষাকে পুঁজি করে মিশে যাচ্ছে শহুরে সুশীল সমাজের স্রোতে। এদের জীবনের ঘটনাসূমহের বর্ণনাতেই আমাদের সামনে হাজির হয়েছে গ্রামীণ প্রান্তজনের চিরকালীন ক্ষুধা, কান্নার গল্প। সেই সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, হিংসা-দ্বেষ, মানুষের ভালবাসা, ঘর বাঁধার আকাঙ্খা প্রভৃতি। গ্রামীণ মানুষের সংস্কৃতি চর্চা, কুসংস্কারচর্চা, এমনকি মানুষের অনাচারচর্চাও বাদ পড়েনি এ উপন্যাসে।

উপন্যাসের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ পরে ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রচণ্ডভাবে আসে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ। তবে প্রথম থেকেই মুনসি ও ভবানী পাঠকের গোড়া সৈন্যদের সাথে লড়াইয়ের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছিল। '৪৭এর দেশবিভাগ উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে। দেশভাগের সময়, এর আগের

কয়েক বছর আর স্বল্প পরিসরে পরের কিছুদিনের চিত্র উপন্যাসটিকে রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। পূর্ব বাংলার মুসলমানদের স্বাধীন পাকিস্তান জন্মের প্রতি তীব্র আকাঙ্খা, পরবর্তীতে পাকিস্তান সৃষ্টির পর দরিদ্র মানুষের স্বপ্ন ভঙ্গ, দেশভাগের নিমিত্তে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা কোনকিছুই এড়িয়ে যাননি ঔপন্যাসিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াছ।

সর্বোপরি রাজনৈতিক একটি চরিত্র থাকলেও মানুষের গন্তব্যহীন জীবন, ফলাফলহীন চিরকালীন যাত্রার শাশ্বত কাহিনীই শেষ পর্যন্ত অবয়ব লাভ করেছে উপন্যাসে। এই উপন্যাসের চরিত্র চেরাগ আলীর খোয়াবনামা, আর ঔপন্যাসিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াছের খোয়াবনামা কোথায় যেন একবিন্দুতে মিলে গেছে।

আখতারুজ্জামানের লেখার প্রধান শক্তি হল ভাষা। বিষয়ের প্রেক্ষিতে ও চরিত্র ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজনে তাঁর ভাষা হয়ে উঠেছে অনন্য। বিষয়, চরিত্র ও ভাষার এই অবিমিশ্রতা সম্পর্কে তিনি বেশ সচেতন ছিলেন। শ্রমজীবির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে ভাষা ব্যবহারে লেখকের মনযোগ লক্ষ্যণীয়। সব মিলিয়ে আখতরুজ্জামান ব্যক্তির জীবন পরিসরকে কিংবদন্তী, ইতিহাস ও সমকালের এমন এক পটে মেলে ধরেছেন যে তাঁর প্রতিটি লেখাই হয়ে উঠেছে আমাদের জীবনের অস্তিত্বগাঁথা, একইসাথে বর্তমান ও ভবিষ্যতের মহাকাব্যিক আলোচনা।

মা

লেখকের নাম : আনিসুল হক
প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৪
প্রকাশক : সময় প্রকাশ
পৃষ্ঠা : ২৭২
মূল্য : ৩০০ টাকা

বর্তমান বাংলা কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম সাহিত্যিক আনিসুল হক। অনায়াস লব্ধ সহজ-সরল ও কৌতূকপ্রধান গদ্যের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন সাংবাদিকতা এবং প্রাণের টানে করছেন লেখালেখি। ইতিহাস, সমাজ ও মানবিকতার প্রতি

দায়বদ্ধতা তাঁর লেখায় সুস্পষ্ট। তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয় হিসেবে এক বড় অংশজুড়ে রয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। এই মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'মা'। উপন্যাসটি একজন তরুণ মুক্তিযোদ্ধার দৃঢ়চেতা মায়ের সংগ্রাম কাহিনী নিয়ে লেখা।

সত্য ঘটনা নির্ভর এ উপন্যাসের কাহিনীর সন্ধান পান মুক্তিযোদ্ধা নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর কাছ থেকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আজাদ ও তাঁর মায়ের জীবনে মুক্তিযুদ্ধের সময় ঘটে যাওয়া কাহিনী নিয়ে রচিত উপন্যাসটি ব্যাপক প্রশংসিত হয় এবং প্রচুর পাঠকপ্রিয়তা পায়।

উপন্যাসের কাহিনী মাগফার হোসেন চৌধুরী আজাদ এবং তাঁর মায়ের জীবন নিয়ে। শহীদ আজাদের মা সাফিয়া বেগম ছিলেন ঢাকার সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একজনের স্ত্রী। তিনি ছিলেন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন একজন মানুষ। তার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করলে তিনি স্বামীকে ছেড়ে চলে আসেন। অভাব অনটন পিছনে ফেলে আজাদকে তিনি মানুষের মত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আজাদ তার বন্ধুদের সাথে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। তারা 'হিট এন্ড রান' পদ্ধতিতে অনেকগুলো গেরিলা অভিযান সফল করে। ১৯৭১ সালের ৩০আগষ্টের রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে ঢাকার বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা গেরিলা ধরা পরে। তাদের একজন আজাদ। তাকে প্রচন্ড নির্যাতন করে পাকিস্তানীরা। কিন্তু তার কাছ থেকে কোন তথ্য বের করতে পারে না। পাকিস্তানি চর এসে আজাদের মাকে বলে, ছেলেকে যদি ফিরে পেতে চান, তাকে বলেন সে যেন সবার নাম বলে দেয়।' মা একমাত্র সন্তানকে দেখার সুযোগ পান রমনা থানায়। আজাদ বলে, মা কী করব? এরা তো খুব মারে। স্বীকার করতে বলে। সবার নাম বলতে বলে। মা বলেন- বাবা রে, যখন তোমাকে মারবে, তুমি শক্ত থেকো। সহ্য করো, কারো নাম বলে দিও না। আজাদ বলে আচ্ছা মা ভাত খেতে ইচ্ছা করে দুই দিন ভাত খাই না। কালকে ভাত দিয়েছিল, আমি ভাগ পাই নাই। মা বলেন- 'আচ্ছা, কালকে যখন আসব, তোমার জন্য ভাত নিয়ে আসব।' তখনি সেন্ট্রি এসে বলে সময় শেষ, যান গা। মা হাঁটতে হাঁটতে কান্না চেপে ঘরে ফিরে আসেন। পরের রাতে দুটো টিফিন ক্যারিয়ারে ভাত, মুরগির মাংস, আলু ভর্তা, বেগুনভাজি নিয়ে মা যান রমনা থানায়। কিন্তু আজাদকে দেখতে পান না। তিনি দৌড়ে যান এমপি হোস্টেলে সেখানেও আজাদ নেই। আজাদ নেই।

এর পর আজাদের মা বেঁচে ছিলেন আরো ১৪বছর, ১৯৮৫ সালের ৩০ আগষ্ট পর্যন্ত। এই ১৪ বছরে তিনি কোনদিন মুখে ভাত দেননি। একবেলা রুটি খেয়েছেন, কখনো পাউরুটি খেয়েছেন পানি দিয়ে ভিজিয়ে। কিন্তু ভাত নয়।

তিনি আর কোনো দিন বিছানায় শোননি। মেঝেতে পাটি বিছিয়ে শুয়েছেন। ১৪ বছর পর মা মারা যান নিঃস্ব, রিক্ত বেশে। মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে কবরে শায়িত করলে আকাশ থেকে ঝিরঝির বৃষ্টি ঝরতে থাকে। জুরাইন করবস্থানে তার সমাধিতে লেখা হয় তাঁর একমাত্র পরিচয় শহীদ আজাদের মা।

এ উপন্যাসের রচনানৈপুণ্য অনস্বীকার্য। সে নিপুনতা কোন ভাবেই আরোপিত নয়। লেখক এমনভাবে নিজেই জড়িয়ে পড়েন এই ঘটনাপ্রবাহে যে তিনি এরই অংশীদার হয়ে যান আর পাঠকের সঙ্গে ভাগ করে নেন নিজের অভিজ্ঞতা। তাঁর প্রাঞ্জল কথ্যভাষার রূপ হঠাৎ বদলে যায় ঘটনা প্রবাহের আকস্মিকতায়। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা উপন্যাস হিসেবে এবং মাকে নিয়ে লেখা উপন্যাস হিসেবে আনিসুল হকের 'মা' যে কোনো সময়ের একটি প্রধান উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করবে।

আগুন পাখি

লেখকের নাম : হাসান আজিজুল হক
প্রথম প্রকাশ : ২০০৬
সংস্করণ : বইমেলা ২০১১
প্রকাশক : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
পৃষ্ঠা : ২২৪
মূল্য : ২২৫ টাকা

বাংলা কথাসাহিত্যের একজন শক্তিমান লেখক হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯)। ষাটের দশকে আবির্ভূত এই কথাসাহিত্যিক সরল ও সুঠাম গদ্য এবং মর্মস্পর্শী বর্ণনার জন্য বিখ্যাত। বঙ্গ সাহিত্যে উজ্জ্বলতম কথাসাহিত্যিকদের অন্যতম। তার চিন্তা-ভাবনা, সমাজ ও সাহিত্যে রচনা দু'বাংলাতেই বহুকাল যাবত প্রকাশিত হয়ে আসছে। জীবন সংগ্রামে লিপ্ত মানুষ তাঁর লেখার প্রধানতম অনুষঙ্গ। পাশাপাশি প্রাধান্য পেয়েছে দেশভাগের যন্ত্রণা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ব অস্থিরতা। দেশভাগের নির্মম অভিজ্ঞতা আজিজুল হককে গোপনে করেছে রক্তাক্ত আর তাঁর গল্পের মানুষকে করেছে নিঃশিকড়, উৎপীড়িত। দেশভাগের পটভূমিতে লেখা তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'আগুন পাখি' (২০০৬)। উপন্যাসটি এক নারীর বাস্তুর প্রতি মমত্ববোধের মানবিক আখ্যান।

উপন্যাসের কাহিনী বর্ধমান জেলার বাঁকুরা অঞ্চলের প্রত্যন্ত এক গ্রামের সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবার ও পরিবারের আশে-পাশের হিন্দু-মুসলমানদের জীবন থেকে নেওয়া। উপন্যাসের মূলচরিত্র লেখাপড়া না জানা গাঁয়ের একটি মেয়ে। সে মেতর বউ। বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ির মানুষদের বাইরে সে জানে চার পাশের মানুষ জনকে। যাদের বেশির ভাগই হিন্দু। হিন্দু বলে তাঁরা যে আলাদা, তেমন তো কিছু বোঝে না সে। গভীর মমতায় সে গড়ে তোলে তাদের বড় একান্নবর্তী সংসার, আর রাতের নিরালায় স্বামীর কাছে শিখে নেয় অল্পসল্প লেখাপড়া। সুখ দুঃখ এর নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে দেখে কেমন করে তার স্বামী জড়িয়ে পড়ে সামাজিক কাজে, হিন্দু মুসলামান দুই সম্প্রদায়েরই কাছে অনেক প্রিয় একজন নেতা হয়ে উঠে সে। কিন্তু হঠাৎ যেন পাল্টে যায় সব। তাদের একান্নবর্তী সংসারে ধরে ভাঙ্গন, আর বাইরেও কোথা থেকে রব উঠে দেশটাও নাকি ভাগ হয়ে যাবে। তা কি করে হয়? দেশ আবার ভাগ হয় কেমন করে? অবিশ্বাস্য সেই ঘটনাও সত্য হল একদিন। মুসলমান পাড়া প্রতিবেশীরা চলে যেতে লাগল ভিটে ছেড়ে। পরিজনেরাও গেল। কিন্তু যে নারী স্বামীর প্রয়োজনের সময় গহনা ছাড় দিতে দ্বিধায় পড়ে যায়, সেই নারীই ধর্মের দোহাই দিয়ে দেশভাগের ভন্ডামী সহ্য করতে পারে না। কিছুতেই রাজি হয় না স্বামী সন্তানদের সাথে মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ পাকিস্তান যেতে। সে কিছুতেই যাবে না। সে বলে আমাকে কেউ বুঝাইতে পারলে না কেনো আলাদা একটা কেন প্রয়োজন? এ দেশটি আমার নয়? সেই মেয়েটির মুখে আটপুড়ে ভাষায় বলা- এ এক বুক ভাংগা দেশ ভাগের গল্প।

উপন্যাসটি আমাদের ইতিহাসেরই রক্তক্ষরণের দলিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, বিলেতী পন্য বর্জন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, সাতচল্লিশের দেশ বিভাগ এবং দুটো সম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে উপদ্রুত পল্লী বাংলার একটি সাধারণ মুসলিম পরিবারের শিক্ষাদীক্ষাহীন এক নারীর আঞ্চলিক বয়ানে বিশিষ্ট হয়ে উঠা এক ইতিহাস। এ উপন্যাসের কাহিনীতে সেই অর্থে কোন গল্প ফাঁদা নেই, বলার মতো প্রণয় নেই, আকৃষ্ট করার মতো নূন্যতম কোনো যৌনতা নেই, এমনকি যে ভাষায় উপন্যাসটি কথিত হয়েছে, সেই ভাষাটির সাথেও এদেশের অধিকাংশ পাঠকের বিশেষ কোন যোগযোগ নেই।

শিল্প সাহিত্য, ইতিহাস ঐতিহ্য আর আপন জাতিসত্তার অস্তিত্বের প্রতি দায়বদ্ধতা না থাকলে আগুন পাখির মতো উপন্যাস লেখা তো দুরের কথা পড়াও যায় না।

বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনৈতিক ইতিহাসে বারবার রূপান্তর ঘটেছে। আর হাসান আজিজুল হকের লেখায় সে রূপান্তরের চমকপ্রদ ছবি ফুটে উঠেছে। তাতে শৈল্পিক নান্দনিকতাবোধের পাশপাশি রয়েছে ব্যক্তিক যন্ত্রণাবোধের প্রবল উপস্থিতি।

কাব্য

মেঘনাদবধ কাব্য

লেখকের নাম	: মাইকেল মধুসূদন দত্ত
প্রথম প্রকাশ	: ১৮৬১
সংস্করণ	: বইমেলা ২০১৫
প্রকাশক	: মাওলা ব্রাদার্স
পৃষ্ঠা	: ২৫৩
মূল্য	: ২৫০ টাকা

উনিশ শতকের বাঙ্গালী রেঁনেসার মানসপুত্র হিসেবে সুপরিচিত মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। মধুসূদনের হাতেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সার্থক সমৃদ্ধি। তিনিই প্রথম সার্থক বাংলা মহাকাব্য, নাটক, ট্রাজেডী, প্রহসন ও সনেটের জনক। বাংলায় সনেট রচনা ও বাংলা কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার তাঁর সাহিত্যে অবদান গুলোর মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত বাংলা প্রথম মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য'।

হিন্দু পুরানের কাহিনী অবলম্বন করে গ্রিক রীতিতে কাব্যটি রচিত। সংস্কৃত মহাকাব্য 'রামায়ণ'-এর ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ কাহিনী অবলম্বনে মধুসূদন দত্ত 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করেন। রাবণের সীতা হরণ, রাম-রাবণের লঙ্কাযুদ্ধ এবং যুদ্ধে রাবণের পরাজয়ের কাহিনী নিয়ে এ মহাকাব্য রচিত হয়েছে। মূল উপজীব্য রামায়ণ হলেও সর্বাংশে রামায়ণকে অনুসরণ করা হয়নি। প্রতিটি চরিত্রের উপর বাল্মীকির থেকে ইয়ং বেঙ্গলের প্রভাব অনেক বেশি। কাব্যে লঙ্গাকান্ডের স্থান লঙ্কাদ্বীপের পরিবর্তে হিন্দু কলেজ। ভাষাতেও রয়েছে আধুনিকতার ছাপ। এ কাব্যের বিরাট পটভূমির মধ্যে নানা ধরনের চরিত্র এবং নানা রসের সমাবেশ ঘটেছে। ১৮৫৭ সালে সংঘটিত সিপাহী বিপ্লবের স্বাধীনতামন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে রাবণকে নায়ক ও রামকে খলনায়ক বানিয়ে মধুসূদন রচনা করলেন স্বাধীনতাবিলাসী কাব্য। দুই খন্ড নয় সর্গে সম্পূর্ণ 'মেঘনাদবধ কাব্য' বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ থেকে মেঘনাদ হত্যা, প্রমীলার চিতারোহণ পর্যন্ত মোট তিন দিন তিন রাতের ঘটনা বর্ণিত। এ কাব্যের ট্রাজেডি সৃজন হয়েছে নায়ক রাবণ চরিত্রকে অবলম্বন করে।

কবি মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট মহাকাব্যে শয়তান যেমন দুর্জয় বাসনা ও ঋজুতা প্রদর্শন করে, মধুসূদনও রাবণকে দিয়ে সে কাজ করিয়েছেন। ভাব-ভাষা ও শব্দ ব্যবহারে কবি বিদেশী ক্লাসিক রীতি আয়ত্ত করে তা বাংলায় ব্যবহার করেছেন। কাব্যের বিভিন্ন সর্গে বীরত্ব, অভিমান, আক্ষেপ ইত্যাদি

প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি প্রধান চরিত্র- রাবণ, মেঘনাদ, লক্ষ্মণ, রাম, প্রমীলা, বিভীষণ, সীতা, সরমা ইত্যাদি।

কবি কাব্যের প্রথম দিকে বীররসের কথা বললেও এই কাব্যে করুণরসই প্রধান। এ কাব্যের বিষয়বস্তু বাল্মীকির রামায়ণ থেকে গ্রহণ করলেও দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন মিল্টনের প্যারাডাইজ লস্ট থেকে। মধুসূদন রামচন্দ্রের জয়ের উপর নয়, রাবণের পরাজয়ের উপর আলো ফেলেছেন। বিশেষ করে চতুর্থ সর্গে রাবণের ভাই বিভীষণের সহায়তা নিয়ে লক্ষ্মণের হাতে রাবণের পুত্র মেঘনাদের বধের দিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। বাল্মীকির রামায়ণে দেখানো হয়েছে লক্ষ্মণ ও তার বানর বাহিনীর আক্রমণে প্রহরীদের বিপর্যস্ত হতে দেখে যজ্ঞ ত্যাগ করে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হয়েছিলেন মেঘনাদ এবং সেখানেই লক্ষ্মণের হাতে মেঘনাদের মৃত্যু হয়। কিন্তু মধুসূদন এ ঘটনাকে এভাবে না দেখিয়ে নিরস্ত্র মেঘনাদ যখন অপরাজেয় হওয়ার জন্য অগ্নির পুঁজা করছিলেন, তখন লক্ষ্মণের হাতে অন্যায়ভাবে নিহত হওয়ার দৃশ্য অঙ্কন করেন। এর মাধ্যমে রাক্ষসদের ট্রাজিক বীরে পরিণত করার যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা স্বার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলেন। এর সঙ্গে তুলনীয় হোমারের ইলিয়ড মহাকাব্যে যেমন গ্রীকদের হাতে ট্রয়ের পতন দেখানো হয়েছ।

তিনি মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট থেকে কেবল দৃষ্টিভঙ্গীর আদর্শ গ্রহণ করেননি অমিত্রাক্ষরের আদর্শও গ্রহণ করেন। অর্থাৎ বিষয়-দৃষ্টিভঙ্গীর পাশাপাশি কাঠামোগত দিক থেকেও তিনি জন মিল্টনকে আদর্শ হিসেবে নিয়েছেন। এছাড়া কাব্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি ব্যাস, বাল্মীকি, হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিল্টন ও তাসোকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর এ কাব্য পুরোপুরি তাদের মান অর্জন করেছে। কেবল উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে নয়, ভারতীয় উপমহাদেশের গোটা আধুনিক সাহিত্যেই তাঁর সমকক্ষতা কেউ লাভ করতে পারে নি।

মেঘনাদবধ কাব্যে লঙ্কার সৌন্দর্য যেভাবে দেখানো হয়েছে তাতে প্রতিফলিত হয়েছে উপমহাদেশের চিরকালীন সংস্কৃতি ও ধর্ম, যাকে মধুসূদন আখ্যায়িত করেছেন 'আমাদের পূর্ব পুরুষদের ঐতিহ্যমন্ডিত পৌরাণিক' কাহিনী বলে। এ কাব্যে মধুসূদনের অসাধারণ আবেগঘন, উচ্ছ্বাসপূর্ণ, রসোজ্জল, মননশীল এবং শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী ব্যক্তিত্বের অনুকরণীয় প্রতিফলন ফুটিয়ে তুলেছেন। তার এ ধ্রুপদী রচনা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মকে আকর্ষণ করে আসছে।

সোনার তরী

লেখকের নাম : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রথম প্রকাশ : ১৮৯৪
সংস্করণ : ২০১৪
প্রকাশক : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা
পৃষ্ঠা : ১৯১
মূল্য : ১৮০ টাকা

সোনার তরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সপ্তম কাব্যগ্রন্থ। এ কাব্যে ৪৩টি কবিতা আছে। এ কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতাটি একটি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কবিতা। এ কবিতার ব্যাখ্যা নিয়ে সমকালে নানা মত প্রচলিত ছিল। সাধারণভাবে দেখলে দেখা যায় এ কবিতায় বর্ণিত হয়েছে- বর্ষাকাল, একটি দ্বীপে মতো একটি জায়গা, চারিদিকে নদী, প্রচন্ড স্রোত। আকাশে মেঘ গর্জন করছে। এমন একটি দুর্যোগপূর্ণ ঘন বর্ষার দিনে একজন কৃষক নদীর তীরে এক ক্ষেতে ধান কাটছে। সারাদিন খেটেখুটে রাশি রাশি ধান স্তুপীকৃত করেছে। তার সমগ্র উৎপাদন তার ধানটুকুই। এ ধান মূল ভূখন্ডে নিয়ে যাওয়ার জন্য নৌকা দরকার। সে নৌকার জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে। এমনই সময় এক বেপরোয়া মাঝি তার নৌকা নিয়ে আসে। সে কৃষককে দেখেও চলে যেতে থাকে। কৃষকের অনুরোধে সে ধান নিতে রাজি হয় কিন্তু সে নৌকায় কৃষকের জায়গা হয় না। ফসল তীরে পৌছলেও পৌছতে পারে না কৃষক নিজে। এই হল কবিতার আক্ষরিক অর্থ।

এই আক্ষরিক বর্ণনাকে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যায় মাঝি হল মহাকালের প্রতীক আর বাঁকা জল কালস্রোতের প্রতীক। মহাকালের চিরন্তন স্রোতে মানুষ অনিবার্য মৃত্যু বা মহাকালে হারিয়ে যাওয়া এড়িয়ে যেতে পারে না। কেবল টিকে থাকে তার সৃষ্ট কর্ম বা সোনার ফসল। একইভাবে কবির সৃষ্টিকর্ম বা কবিতা কালের সোনার তরীতে স্থান পেলেও ব্যক্তি কবির স্থান সেখানে হয় না। এ অতৃপ্তির বেদনা নিয়ে তাকে অপেক্ষা করতে হয় অনিবার্যভাবে মহাকালের শূণ্যতায় বিলীন হওয়ার জন্য।

মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের ক্ষেতটুকু দ্বীপের মতো। চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে পরিবেষ্টিত। ঐ একটুখানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে। নিঃসঙ্গ কবি জীবনের নদীকূলে ভরসা বিহীন একাকী বসে ভাবেন ফেলে আসা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি ফলিয়েছেন কর্মের ফসল। রাশি রাশি কর্মের ভারা ভারা ফসল কবির জীবনে আনলো সফলতা। কিন্তু কর্মে

কর্মে কখন যে সময়ের নদীতে ক্ষুরধারা স্রোত বিগত হলো তা টের পান নি। জীবনের কর্মের সোনালী ফসল ভোগ করার দিনে এসে এক সময় জীবনের ব্যাপ্তি হলো শেষ। জীবনের জমিতে কর্মের চাষ করে ফসল তুলতে গিয়ে কবি দেখেন অন্তিম বর্ষার কাল জলধারা এসে তার জীবনের জমিন দ্বীপখানি ডুবিয়ে দিয়ে অব্যক্ত'র মাঝে বিলীন করে দিতে সমাগত। চারিদিকে অব্যক্ত মহাশূন্যতা আর তারই মাঝে ছোট জীবন-দ্বীপে একাকী চাষী কবি।

সোনার তরী কাব্যের জন্ম স্মৃতি জানাতে গিয়ে কবি লিখেন- ছিলাম তখন পদ্মার বোটে। জলভারনত কালো মেঘ আকাশে, ওপারে ছায়াঘন তরুশ্রেণীর মধ্যে গ্রামগুলি, বর্ষার পরিপূর্ণ পদ্মা খরবেগে বয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে পাক খেয়ে ছুটেছে ফেনা। নদী অকালে কূল ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কাঁচা ধানে বোঝাই চাষীদের ডিঙি নৌকা হু হু করে স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। ঐ অঞ্চলে এই চরের ধানকে বলে জলি ধান। ভরা পদ্মার ঐ বাদল-দিনের ছবি 'সোনার বাংলা' কবিতার প্রচ্ছন্ন ছন্দে প্রকাশিত।

আলোচ্য এ কাব্যগ্রন্থে 'সোনার তরী' ছাড়াও কবির আরও অনেক বিখ্যাত কবিতা রয়েছে। একটি বিখ্যাত কবিতা 'পরশ পাথর'। এ কবিতায় বর্ণিত হয়েছে কেউ একজন জীবনের আরাম-আয়েশ, সুখ-সুবিধাকে বিসর্জন দিয়ে কোন বৈজ্ঞানিক বা ধর্ম-দর্শনের মত মহৎ কিছুর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। জীবনের কোন এক সময় তাদের অভীষ্টকে হয়ত খুঁজে পায়, কিন্তু অন্যমনষ্কতার কারণে ধরে রাকতে পারে না। পরে চেতনা হলে জীর্ণ জীবন নিয়ে আবার কাঙ্ক্ষিতের সন্ধানে ফেরে, কিন্তু সে ফেরা বৃথা বলেই মন্তব্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ গ্রন্থের আরও কবিতায় বৈরাগ্যবাদের প্রতি এমন মনোভাবই কবি ব্যক্ত করেছেন। এ গ্রন্থের 'বৈষ্ণব-কবিতা' এ সবকিছুতে মানবিক মূল্য আরোপ করেছেন। আবার বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে কবির দার্শনিক মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে 'দুই-পাখি' কবিতাটিতে।

বাঙ্গালী জীবনে একটি বহুল পঠিত কবিতা 'যেতে নাহি দিব হায়' - এটিও এ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত। এ কবিতাটিতে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত জীবনের অকৃত্রিম ছবি ফুটে উঠেছে। এছাড়া দেশের মায়াবাদী প্রবণতার ব্যর্থতার ছবি এঁকেছেন 'আকাশের চাঁদ' কবিতায়। কবির জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কিত ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে 'প্রতীক্ষা' কাবতায়। এছাড়াও এ কাব্যগ্রন্থে রয়েছে 'মানসসুন্দরী' ও 'পুরস্কার' এর মত উঁচু মাপের দার্শনিকতা সম্বন্ধীয় কবিতা।

এ কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে 'বসুন্ধরা' কবিতাটি। সুদীর্ঘ এ কবিতাটিতে রবীন্দ্র কবি প্রতিভার দু'টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ রয়েছে। একটি সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা, অন্যটি সর্বানুভূতি। এর সর্বশেষ কাব্য 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। এ কবিতায় কবি তাঁর কল্পনাদেবীর কথা বলেছেন। কবি বলেছেন এই কল্পনাদেবীই তাকে চালিত করছেন, কোন এক নিরুদ্দেশে কবিকে নিয়ে চলেছে। কিন্তু কখনোই কল্পনাদেবী তাকে ধরা দেয়না। এ কবিতায় কবির অধরা সৌন্দর্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সোনার তরী'। এ কাব্যগ্রন্থে জগত ও জীবনের প্রতি কবির দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। এর মাধ্যমে বাংলা গীতি কবিতা লাভ করেছে সমৃদ্ধি।

মহাশ্মশান

লেখকের নাম	: কায়কোবাদ
প্রথম প্রকাশ	: ১৯০৫
ধরণ	: মহাকাব্য
প্রকাশক	: স্টুডেন্ড ওয়েজ
পৃষ্ঠা	: ৮৭০
মূল্য	: ৪০০ টাকা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বাঙ্গালী মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম মহাকবি কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২)। সাহিত্যাঙ্গনে কয়কোবাদ নামে পরিচিত হলেও তাঁর প্রকৃত নাম কাজেম আল কোরেশি। উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি জাতীয় উদ্দীপনামূলক কবিতা রচনা করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে ভারতীয় জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য মানে ছিল হিন্দু ও মুসলমানের ইতিহাস ঐতিহ্য। তাই তিনি হিন্দু মুসলমান উভয়ের বীরত্বের ঐতিহ্য তুলে ধরেছিলেন তাঁর লেখায়। একজন গীতিকবি হিসেবে সাহিত্যচর্চা শুরু করলেও মহাকাব্য রচনাতেই প্রতিভা বিকাশের সার্থকতা অনুভব করলেন এবং গীতিকবিতার সর্বগ্রাসী প্রভাব উপেক্ষা করে মহাকাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর একমাত্র মহাকাব্য 'মহাশ্মশান'। এটি বাংলা সাহিত্যের সর্ববৃহৎ মহকাব্য। মোট ষাট সর্গে ৮৭০ পৃষ্ঠাব্যাপী এ মহাকাব্য রচনায় দীর্ঘ দশ বছর

সময় লেগেছিল। কায়কোবাদ ১৭৬১ সালে সংঘটিত পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহাকাব্যটি রচনা করেন।

বর্তমানে ভারতের হরিয়ানা প্রদেশের অন্তর্গত প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্র পানিপথ। এই পানিপথে ১৫২৬, ১৫৫৬ ও ১৭৬১ সালে তিনটি বিখ্যাত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তৃতীয় যুদ্ধটি সংঘটিত হয় মুসলিম তথা আহমদ শাহ আবদালী ও মারাঠাদের মধ্যে এবং এই তৃতীয় যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত মহাশশ্মান মহাকাব্যে কায়কোবাদ হিন্দু-মুসলিম উভয়পক্ষের শক্তিক্ষয়কেই মানবিক বিচারের দন্ডে তুলে ধরেছেন। মহাশ্মশান মহাকাব্যের কাহিনীবিন্যাস এরকম- পানিপথের প্রান্তর। একপাশে মুসলিম শিবির, অন্যপাশে মারাঠাদের কুঞ্জুরপুর দূর্গ। দু'পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হবে যে কোন সময়। দু'পক্ষেই চলছে যুদ্ধের মহড়া। মুসলমানদের পক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কাবুলের অধিপতি আহমেদ শাহ আবদালী, রোহিলার নবাব নজীবুদ্দৌলা, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং মেহেদী বেগের কন্যা জোহরা বেগম। অন্যদিকে মারাঠাদের পক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বালাজি রাও পেশোয়া, ত্রিশুল বাহিনীর রঘুনাথ রাও, সদাশিস রাও এবং ইব্রাহিম কার্দি। মুসলিম পক্ষের জোহরা বেগমের স্বামী হিন্দুদের পক্ষের সেনাপতি ইব্রাহিম কার্দি। জোহরা বেগম বারবার ছদ্মবেশ ধারণ করে মারাঠা শিবিরে প্রবেশ করে স্বামী ইব্রাহিম কার্দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু ইব্রাহিম কার্দি নিজ সিদ্ধান্তে অটল। জোহরা বেগমকে গভীরভাবে ভালাবাসলেও আদর্শগত কারণেই ফিরে আসতে নারাজ। কারণ ইব্রাহিম কার্দির যখন কোন কর্মসংস্থান ছিল না তখন হিন্দু মারাঠারাই তাকে চাকরি দিয়েছে এবং পদোন্নতি দিয়ে সেনাপতি বানিয়েছে। অতএব মারাঠাদের বিপদের দিনে তাদের ফেলে সে চলে আসতে পারে না। অন্যদিকে জোহরা বেগমও তার জায়গায় অনড়। হিন্দু-মুসলিম দু'পক্ষই পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার আক্রোশে ফেটে পড়ে। হঠাৎ করে অতর্কিত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অত্যন্ত ভয়ংকর ও বিধ্বংসী পরিণাম ঘটে। দু'পক্ষে হতাহত ও মৃত্যু ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতিহিংসা ও ক্ষমতা দখলের সমস্ত নৃশংসতাকে ছাড়িয়ে যায়। যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করে। মারাঠা বাহিনীর সেনাপতি ইব্রাহিম কার্দি ধৃত হয়। জোহরা বেগম ওই যুদ্ধের সর্বাধিপতি আহমদ শাহ আবদালীর কাছে স্বামী ইব্রাহিম কার্দির মুক্তি দাবি করে। সর্বসম্মতিক্রমে মুক্তির ফরমান নিয়ে জোহরা বেগম কারাগারে ইব্রাহিম কার্দিকে মুক্ত করতে গিয়ে দেখে ইব্রাহিম কার্দি মারা গেছে। ইব্রাহিম কার্দি ক্ষুদ্র মুক্তিকে অস্বীকার করে বৃহৎ মুক্তিকে গ্রহণ করেন।

তিন খন্ডে বিভক্ত এ মহাকাব্যের প্রথম খন্ডে উনত্রিশ সর্গ, দ্বিতীয় খন্ডে চব্বিশ সর্গ ও তৃতীয় খন্ডে সাত সর্গ রয়েছে। মহাশ্মশান কাব্যের কাহিনীবিন্যাসে একদিকে যেমন যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির মধ্যে দিয়ে যুদ্ধবিরোধী চেতনার বিকাশমুখী প্রবাহ প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি প্রধান নারী চরিত্র জোহরা বেগমের জীবনে নেমে এসেছে নিয়তিনির্ভর পরিহাসের বিয়োগান্ত পরিণতি। আদর্শগত দ্বন্দ্বের কারণে ইব্রাহিম কার্দি মারাঠাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। বিষয়বস্তু, ঘটনা ইতিহাসনির্ভর হলেও কল্পনার প্রাধান্য প্রত্যুজ্জ্বল এবং মানবীয় আবেগ প্রস্ফুটিত।

যুদ্ধাবসানে পানিপথের প্রান্তরে অবশিষ্ট যে কয়টি মানব-মানবীর হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করা যায় তারা সকলে অবান্তর রণক্ষেত্রের চেয়েও ভয়াবহরূপে বিধ্বস্ত ও ক্ষতবিক্ষত। প্রান্তরের চেয়ে এই রক্তাক্ত অন্তরই পাঠককে আন্দোলিত করে। এ মহাকাব্য সম্পর্কে আবুল কালাম শামসুদ্দিন লিখেছেন- 'মহাশ্মশান কাব্য বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে একটি উজ্জ্বল রত্ন। মহাশ্মশানের ন্যায় বৃহদাকার কাব্য বোধ হয় বঙ্গ সাহিত্যে আর নেই।'

ইতিহাস ও কল্পনার অসাধারণ যুগলবন্দী এ কাব্যে কায়কোবাদ কোথাও ইতিহাসকে বিকৃত করেননি কিংবা ঐতিহাসিক কোন চরিত্রকে এতটুকু হীন করেও দেখাননি। এর মাধ্যমে কবি তাঁর নিরপেক্ষ ইতিহাস ও মানবিক চেতনার পরিচয় দিয়েছেন এবং বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন এমন এক মহাকাব্য রচনা করে।

গীতাঞ্জলি

লেখকের নাম	: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রথম প্রকাশ	: ১৯১০
সংস্করণ	: জুন ২০১৪
প্রকাশক	: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা
পৃষ্ঠা	: ১৯০
মূল্য	: ১৯০ টাকা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সার্থক বিকাশ ও পরিণতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে। বাংলা ভাষার সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। তিনি বাংলা তথা গোটা ভারতবর্ষের কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, নাট্যকার, সংগীতস্রষ্টা ও দার্শনিক। প্রথম বাঙ্গালী নোবেল পুরস্কার জয়ী সাহিত্যিকও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'গীতাঞ্জলি' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১০ সালে। এই গ্রন্থে মোট ১৫৭টি গীতিকবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলো ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন ভক্তিমূলক রচনা। ১৯০৮-০৯ সালের মধ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতাগুলো প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯১০ সালে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। গীতঞ্জলি কাব্যে কবিতাগুলো রচনার প্রেক্ষাপট ছিল এরূপ- ১৯০৮ সালে পুজার ছুটিতে বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহে গিয়েছিলেন। ছুটির পর শান্তিনিকেতনে ফিরে একটানা পাঁচ মাস ছিলেন। পরের বছর বর্ষা ও শরৎকালে তিনি কিছুদিন শিলাইদহে ছিলেন এবং পরে জোড়াসাকো ঠাকুর বাড়িতে কাটান। ঐ সময়ে শিলাইদহ, শান্তিনিকেতন ও ঠাকুর বাড়িতে অবস্থান করার সময়ে লিখেছিলেন গীতাঞ্জলি কাব্যের কবিতাগুলি। জানা যায় ঐ সময়ে তিনি কঠোর নিরামিষভোজী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্রম পরিচালনার আদেশগুলি এই সময় কঠোরভাবে মেনে চলতেন। এমনকি অসুস্থতার সময়ে ডাক্তার আমিষ খাওয়ার পরামর্শ দিলেও তিনি তা শোনেন নি।

গীতের মাধ্যমে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে অঞ্জলি প্রদান করা হয় বলে এর নাম 'গীতাঞ্জলি'। এতে গানে গানে স্রষ্টার প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করা হয়েছে। গীতাঞ্জলি কাব্য তাঁর জীবনবোধ, প্রেমবোধ, নিঃসর্গ চেতনা, সৌন্দর্যবোধ, মানবাত্মা সম্পর্কে গভীর উপলব্ধির প্রকাশ। পাশাপাশি তাঁর মানবতাবাদ ও ঈশ্বরবন্দনা অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে ধরা দিয়েছে। তবে এ কাব্যগ্রন্থের ঈশ্বরবন্দনা কোন বিশেষ ধর্মানুসারে নয়। স্রষ্টায় বিশালতায় সৃষ্টির প্রার্থনা নিবেদন মাত্র।

মানবজাতির সমস্ত প্রেরণার ছোঁয়া তাঁর গীতাঞ্জলি কাব্যে রয়েছে। গীতাঞ্জলির গীতিকবিতাগুলো একটি মহত্তর ও উন্নত সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। ধর্ম আর দর্শনের গভীর সম্মিলন ঘটেছে তার কবিতায়। এগুলো মূলত গান এবং বেশির ভাগের সুরারোপ রবীন্দ্রনাথ নিজেই করেছেন। এছাড়াও এগুলো সৃষ্টিচেতনা সমৃদ্ধ গীত রসে ভরপুর।

১৯১২ সালের শুরুর দিকে রবীন্দ্রনাথের জাহাজযোগে লন্ডন যাওয়ার কথা ছিল। যাত্রার পূর্বে তিনি অর্শ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং পদ্মা নদীতে নৌকায় বিশ্রাম নিতে শুরু করেন। মূলত এ সময় তিনি তার গীতাঞ্জলি কাব্যকে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা চিন্তা করে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে এ কাব্য ইংরেজীতে অনুবাদ শুরু করেন। এ সময় তিনি গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ থেকে ৫৩টি কবিতা সহজ ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে গীতিমাল্য, নৈবদ্য, খেয়াসহ আরো নয়টি গ্রন্থ থেকে ৫০টি কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। তারপর গীতাঞ্জলির ৫৩টি এবং অন্যান্য কাব্যের ৫০টি কবিতাসহ মোট১০৩ টি অনুবাদকৃত কবিতা নিয়ে একটি পান্ডুলিপি তৈরি করেন। সুস্থ হয়ে লন্ডনে পৌঁছে তিনি অনুবাদকৃত পান্ডুলিপিটি তার ইংরেজ বন্ধু উইলিয়াম রোটেনস্টাইনকে দেন। রোটেনস্টাইন এ পান্ডুলিপিটি টাইপ করিয়ে কবি ইয়েটস ও আরো দুইজন কাব্যবোদ্ধাদের প্রদান করেন। কিছুদিন পরেই গ্রন্থটি ইন্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক 'Song Offerings' শিরোনামে প্রকাশিত হয় এবং ভূমিকা লিখেন কবি ইয়েটস নিজে। ১৬পৃষ্ঠার এই দীর্ঘ ভূমিকার সাথে রটেনস্টেইন অংকিত কবির একটি পেন্সিল স্কেচ প্রতিকৃতি সংযোজন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যটি উৎসর্গ করেন তার ইংরেজ বন্ধু রটেনস্টেনকে। ইংরেজী অনুবাদটি পাশ্চাত্য বিদ্বজ্জন সমাজে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে। টি ডব্লিউ রলেস্ট গীতাঞ্জলি সম্পর্কে লিখেছেন- 'জীবনের মৌল বিষয়ের সাথে এই কবিতাগুলো এত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট যে এর চেতনা এবং বাকপ্রতিমার একটি বিশ্বজনীন তাৎপর্য রয়েছে।' 'Song Offerings' গ্রন্থের জন্য ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে ১ম বিশ্বযুদ্ধ পূর্বের অস্থির সময়ে গীতাঞ্জলির ঈশ্বরবন্দনা, মানবতাবোধ বিশ্ববাসীর মনে শান্তির পরশ দিয়েছিল।

উল্লেখ্য ২০১০ সালে গীতাঞ্জলী প্রকাশের শতবর্ষ-পুর্তি উপলক্ষ্যে কলকাতা মেট্রোর নাকতলা স্টেশনটির নামকরণ করা হয় 'গীতাঞ্জলি মেট্রো স্টেশন'।

অগ্নিবীণা

লেখকের নাম : কাজী নজরুল ইসলাম
প্রথম প্রকাশ : ১৯২২
সংস্করণ : ১০ম, ২০১২
প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স
পৃষ্ঠা : ৬৪
মূল্য : ৮০ টাকা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জল এক কিংবদন্তীর নাম কাজী নজরুল ইসলাম। বাংলা সাহিত্যে যার আগমন এক হাতে দ্রোহের রণতূর্য আর এক হাতে প্রেমের বাঁকা বাঁশরী নিয়ে। সাহিত্যের কালজয়ী আবেদন এবং প্রবাহমান প্রাসঙ্গিকতার বিচারে তিনি কেবল যুগন্ধরই নন, যুগোত্তীর্ণও বটে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অন্যতম জনপ্রিয় বাঙালি কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা'(১৯২২)। এ গ্রন্থে মোট বারটি কবিতা আছে- প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, রক্তাম্বর ধারিণী মা, আগমণী, ধূমকেতু, কামালপাশা,আনোয়ার, রণভেরী, শাত-ইল-আরব, খেয়াপারের তরনী, কোরবাণী ও মোহররম। এছাড়া গ্রন্থটির সর্বাগ্রে বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ-কে উৎসর্গ করে লেখা একটি কবিতাও আছে।

ঔপনিবেশিক শোষণ, সামন্তমূল্যবোধ ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহী রূপে অগ্নিবীণা কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন নজরুল ইসলাম। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অগ্নিবীণা কাব্যটি যখন প্রকাশিত হয় তখন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবিদ্ধ ভারতভূমি। স্বাধীনতার প্রত্যাশায় ভারতবাসী তখন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আর তদানীন্তন বিদেশী সরকারও ভারতবাসীর মুক্তিলাভের আকাঙ্খাকে দমন করার জন্য অবিরত সচেষ্ট। বিদ্রোহ আর ভাঙ্গনের আহ্বানই সমগ্র অগ্নিবীণা কাব্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় সচেতন ভারতবাসী যখন হয়েছে কঠিন সংগ্রামী। ঠিক তখনই অগ্নিবীণায় বিদ্রোহের সুর মূর্ছনা তুললেন নজরুল। মানবতার পক্ষে তিনি উচ্চারণ করেছেন বিদ্রোহের বাণী। এ কাব্যে কবি নজরুল কবিতাকে স্থাপন করেছেন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন বাস্তবতার জটিল আবর্তে। কবিতা তাই হয়েছে সামাজিক দায়িত্ব পালনের শাণিত আয়ুধা।

অগ্নিবীণা কাব্যে নজরুল বিভিন্ন ইতিহাস আশ্রিত বিভিন্ন ধরণের ঐতিহ্য ব্যবহার করেছেন। ভারতীয় পুরান-ঐতিহ্য থেকে পরশুরামের কঠোর কুঠার

ব্যবহার করেছেন সমগ্র অন্যায়-অনাচার বিনাশ করে পৃথিবীতে শান্তি আনয়নের জন্য। আবার পশ্চিম এশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য থেকে ইমাম হাসান-হোসেন যেমন দেশের কল্যাণে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, আমরাও তেমনি দেশের সম্মান ও স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্য যেন জীবন উৎসর্গ করি তিনি সে রূপকল্প সৃষ্টি করেছেন। শাত-ইল-আরব কবিতায় তিনি ইরাকের পরাধীনতার রূপকে আমাদের মাতৃভূমির পরাধীনতার সাথে রূপায়িত করেছেন। তুর্কী বীর কামাল পাশা যেমন নিজের দেশের গৌরব, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে আত্মপ্রত্যয়ী, তেমনি কামাল বাংলায় তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। কামাল তার হাতে জাতীয় অগ্রসর চৈতন্যের প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে। এসব ঐতিহ্য পলায়নের জন্য নয়, আত্মপ্রকাশ ও আত্মমুক্তির জন্য করেছেন।

অরবিন্দ ঘোষের ভ্রাতা ভারতের বিপ্লববাদী আন্দোলনের অন্যতম নায়ক বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। কবি নজরুল নিজেকে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের শিষ্য বলে উল্লেখ করে তাঁকে কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন।

বিংশ শতকের উপনিবেশিক শোষণে জর্জরিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনে ভারতবাসীকে দ্রোহের মন্ত্রে উজ্জীবিত করার প্রয়াসে কাজী নজরুল কাব্য রচনা করেন। তাঁর মতে শত্রুকে বিনাশ করে স্বাধীনতা নিজেদেরই ছিনিয়ে আনতে হবে। তাইতো তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ অগ্নিবীণায় বিদ্রোহের অসি ঝনঝনিয়ে ওঠে। কবিতার বজ্রকণ্ঠ হুঁশিয়ার করে দেয় সবাইকে। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা 'বিদ্রোহী'তে কবির বিদ্রোহের মূল সুর তীব্রভাবে বেজে উঠেছে। তবে বাঁশির কোমল সুরও এতে রয়েছে। 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য'- বিদ্রোহী কবিতার এ চরণটিতেই বিদ্রোহ ও প্রেম একসাথে বেজে উঠেছে। এ চরণটি যেন সমগ্র নজরুল সাহিত্যের অনুবিশ্ব। নজরুলের এই প্রেম ও বিদ্রোহ চেতনা ঐ সময়ের প্রয়োজনে হলেও তাঁর কবিতা আজও মানুষকে আন্দোলিত করে।

নক্সীকাঁথার মাঠ

লেখকের নাম	: জসীম উদ্‌দীন
প্রথম প্রকাশ	: ১৯২৯
সংস্করণ	: জুন ২০১০
প্রকাশক	: পলাশ প্রকাশনী
পৃষ্ঠা	: ৯৩
মূল্য	: ১২০ টাকা

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলা সাহিত্যে পল্লী বাংলার স্বরূপ সন্ধানী কবি জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬) এর আগমন। তাঁর সমকালীন সাহিত্যিকেরা যখন সাহিত্য রচনায় পশ্চিমা আদর্শের মুখী তখন জসীমউদ্‌দীন মনোনিবেশ করলেন পল্লী গ্রামের প্রতি। বিষয় ও কাঠামোগত দিক থেকে স্বদেশি ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে তিনি কাব্যজগতে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। তাঁর কাব্যে গ্রাম বাংলার রূপ-প্রকৃতি ও গ্রামীণ জীবন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আর তাই পরিচিতি লাভ করেছেন পল্লীকবি হিসেবে। জসীমউদ্‌দীনের অমর সৃষ্টি 'নক্সীকাঁথার মাঠ'।

নকশী কাঁথার মাঠ কাব্যোপন্যাসটি রূপাই ও সাজু নামক দুই গ্রামীণ যুবক-যুবতীর অবিনশ্বর প্রেম কাহিনী। নক্সী কাঁথার মাঠ-এর নায়ক রূপাই। এর কাহিনী এরূপ- রূপাই গাঁয়ের ছেলে, কৃষ্ণকায়, কাঁধ পর্যন্ত চুল, বিখ্যাত লাঠিয়াল। সে ভাল বাঁশীও বাজাতে পারে। রূপাইর সঙ্গে পাশের গ্রামের মেয়ে সাজুর ভালবাসা হয়, তারপর তারা বিয়ে করে। তারা সুখের সংসার পাতে। এক সময় রূপাইর বাঁশী বাজানো থেমে যায়। কারণ, যার জন্য বাঁশি বাজানো সে এখন তার ঘরেই। একদিন গভীর রাতে চাঁদ ওঠে, বাড়ির আঙ্গিনায় সাজু রূপাইয়ের কোলে শুয়ে গল্প করে। পুর্ণিমার আলোতে সাজুর রূপ দেখে দারুণ মুগ্ধ হয় রূপাই। কিন্তু অজানা এক আশঙ্কায় রূপাই সংকিত হয়। এত সুখ সইবে তো? এমন সময় হঠাৎ খবর আসে বনগেঁয়োরা তাদের গাজনা চরের পাকা ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে। রূপাই ছুটে যায় বনগেঁয়োদের প্রতিরোধ করতে। সেখানে লড়াইয়ে কয়েকটি খুন হয় এবং রূপাই মামলার আসামী হয়ে ফেরারী হয়। এদিকে সাজু প্রতিরাতে মাটির প্রদীপ জ্বেলে রূপাইর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। দিন চলে যায় রূপাই আর আসে না। হঠাৎ এক গভীর রাতে রূপাই এসে দাঁড়ায় সাজুর সামনে। সাজু দেখে রূপাইর সারা গায়ে কাদা মাটি ও রক্তের দাগ। সাজু বলে আমি তোমাকে আর যেতে দেব না। রূপাই বুঝানোর চেষ্টা করে আমাকে না গিয়ে তো উপায় নেই। ধরা পড়লে ফাঁসি হয়ে যাবে। রূপাই চলে যায়। এটাই ইহলোকে রূপাইর সাথে সাজুর শেষ দেখা।

সাজু কি আর করবে বৃষ্টির জন্য কুলা নামানোর দিনে রূপাইয়ের সাথে প্রথম দৃষ্টি বিনিময় থেকে শুরু করে রূপাইয়ের চলে যাওয়ার রাত পর্যন্ত সমস্ত অতীত স্মৃতি কাঁথার ওপর ফুটিয়ে তুলতে থাকে সুঁই-সুতা দিয়ে। সেই কাঁথা বোনা শেষ হলে সাজু কাঁথাটা তার মায়ের হাতে তুলে দিয়ে বলে আমার কবরের উপর এ কাঁথাটা বিছিয়ে দিও আর রূপাই যদি কোন দিন আমার খোঁজে আসে তাকে বলো আমি তার আশায় কবরের নিচে আছি। বহুদিন পর গাঁয়ের কৃষকরা গভীর রাতে বেদনার্ত এক বাঁশীর সুর শুনতে পায়, আর ভোরে সবাই এসে দেখে সাজুর কবরের পাশে এক ভিনদেশি লোক মরে পড়ে আছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নাগরিক জীবনের সর্বাত্মক প্রভাবের মধ্যেও পল্লীর জীবন মাধুর্যের ছবি একে জসীম উদ্দীন শিক্ষিত মহলে যে সাড়া ফেলেছিলেন তা এক কথায় অতুলনীয়। 'নক্সীকাঁথার মাঠ' সেই অতুলনীয় সার্থকতার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহনকারী কাব্য। এ কাব্য খাঁটি লোককাব্যের নৃত্যের ছন্দে, কখনও প্রবাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দীপ্তিতে, কখনও বা গল্পকথন ও দৃশ্য বর্ণনার গদ্যায়িত ভঙ্গির মধ্যে স্বচ্ছন্দ্যে যাতায়াত করেছে। এতে করে এ কাব্যে এক ঘেঁয়েমি দেখা দেয়নি এবং শেষ পর্যন্ত তা পাঠকের আগ্রহ জাগিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

এ কাব্যগ্রন্থের রূপাই চরিত্রটি বাস্তবের এক ব্যক্তিকে উপজীব্য করে নেওয়া। যার প্রকৃত নাম রূপা। তার বাড়ি ময়মনসিংয়ের গফরগাঁও উপজেলার শিলাসী গ্রামে। রূপাও কাব্যের রূপাইয়ের মতো বলবান বীর ও সেরা লাঠিয়াল ছিলেন। ১৯২৮ সালের শেষ দিকে ময়মনসিংহ গীতিকা সংগ্রহ করতে জসীমউদ্‌দীন গফরগাঁওয়ে এসেছিলেন। সেখানেই রূপার সাথে পরিচয়। তাকে উপজীব্য করেই কবি নক্সীকাঁথার মাঠ কাব্যটি রচনা করেন।

নক্সীকাঁথার মাঠকে আবহমান বাংলার দর্পন বলা যেতে পারে। পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এতে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে ব্যবহৃত লোকগানগুলো একে ভিন্নমাত্রা দান করেছে। গ্রামীণ জীবনের মাধুর্য ও কারুণ্য, বৈচিত্রহীন ক্লান্তিকরতা এবং মানুষের অসহায়তা এই কাব্যের উপকরণ। আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে এই কাব্য একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে লেখা হয়েছিল।

জসীমউদ্‌দীন দক্ষ লেখনীতে পল্লী বাংলার ঘনিষ্ঠ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর কাব্য পড়ে পাঠক একইসাথে কবিতা ও গল্প পড়ার স্বাদ পায়। তাই কেউ কেউ 'নক্সীকাঁথার মাঠ' কে কাব্যপোন্যাস বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর চিত্রিত গ্রাম বাংলার প্রকৃতির শাশ্বত রূপ পাঠক্‌কে আজও আকর্ষণ করে।

বনলতা সেন

লেখকের নাম	: জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)
প্রথম প্রকাশ	: ১৯৪২
সংস্করণ	: ফেব্রুয়ারি ২০১৩
প্রকাশক	: সাহিত্য বিকাশ
পৃষ্ঠা	: ৫৬
মূল্য	: ৮০ টাকা

বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য যখন অনকেটাই পশ্চিমা আদর্শ মুখী তখন বিষয় নির্বাচনে পুরোপুরি স্বদেশ মুখী হয়ে কাব্য চর্চা শুরু করেন জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)। ফলে রূপসী বাংলার কবি হিসেবে সুপরিচিতি লাভ করেন। ভাব ও কাঠামোগত দিক থেকে পশ্চিমাদর্শের অনুসারী হলেও তাঁর কবিতা বাংলার প্রকৃতি এবং মানুষের জীবন ও জীবন সংকটের ঘনিষ্ঠ পরিচায়ক। জনপ্রিয়তার দিক থেকে শীর্ষে জীবনানন্দ দাশের অধিক পরিচিত কাব্যগ্রন্থ 'বনলতা সেন'। এ কাব্যটি প্রধানত রোমান্টিক গীতি কবিতা হিসেবে সমাদৃত।

'বনলতা সেন' জীবনানন্দ দাশের একটি বিখ্যাত কবিতা। যে কবিতাটি বুদ্ধদেব বসু তার 'কবিতা' প্রত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে কবি জীবনানন্দ দাশ 'বনলতা সেন' নামে একটি কাব্যগ্রন্থই রচনা করেন এবং এ কবিতাটি এ কাব্যের অর্ন্তগত করেন। এ কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে কবিতা ছিল মাত্র বারটি, পরবর্তীতে আরো ১৮টি কবিতা যোগ করে মোট ৩০টি কবিতা দিয়ে একটি সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। এ সংস্করণটির প্রচ্ছদ আঁকেন সত্যজিৎ রায়। আপাত দৃষ্টিতে বনলতা সেন একটি প্রেমের কবিতা যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বনলতা সেন নামে এক নারীর স্মৃতি রোমন্থন। তবে শুরু থেকেই পাঠকের কৌতূহল বনলতা সেন কি বাস্তবের কোন নারী নাকি সম্পূর্ণ কল্পিত একটি কাব্যচরিত....

শুরুর কবিতাটির নাম কাব্যগ্রন্থের নামে বনলতা সেন। বনলতা সেন চরিত্রটি জীবনানন্দ দাশের সৃষ্ট বিখ্যাত একটি চরিত্র। এই চরিত্রটি আরো কিছু নামে পরিচিত। যেমন- শ্যামলী, সবিতা, সুরঞ্জনা, সুদর্শনা, সুচেতনা। এই প্রত্যেকটি নাম দিয়েই কাব্যগ্রন্থটিতে একটি করে কবিতা আছে। তবে একটি চরিত্র ঘুরে-ফিরে কবির রচনার এসেছে। বনলতা সেন চরিত্রটির দেখা মেলে অন্তত পাঁচটি কবিতায়। বনলতা গল্পের চরিত্র হয়ে যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে উপন্যাসের নায়িকা হয়ে। কবির রেখে যাওয়া ডায়েরিতে বনলতা সেনের

ব্যাখ্যা আছে সাংকেতিক নোটে। সেই সূত্র ধরে বাস্তবে বনলতা সেনের অস্তিত্ব আছে কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে রক্তে মাংসের বনলতাকে খুঁজে পাওয়া না গেলেও তার ছায়ায় বেড়ে উঠা এই কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতাই স্বীয়গুণে কালজয়ী। আর এ কাব্যগ্রন্থ কালজয়ী কবির উপমা চয়ন, ঐতিহ্যবোধ আর গভীর উপলব্ধি প্রকাশের অনন্য মহিমায়।

এক কথায় বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক পঠিত কবিতা বনলতা সেন। প্রকৃতির কবি আর ধূসরতার কবি অভিধা ছাপিয়ে রোমান্টিকতার তকমা জীবনানন্দ দাশের গায়ে সেঁটে আছে বোধহয় বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের জন্যই। বনলতা সেন মূলত প্রেমের কবিতাসম্ভার, প্রতিটি কবিতাই নিঃশব্দ প্রেম আর অনুপস্থিত প্রেমিকার প্রতি স্বগত উচ্চারণ।

সাত সাগরের মাঝি

লেখকের নাম	: ফররুখ আহমদ
প্রথম প্রকাশ	: ১৯৪৪
সংস্করণ	: ফেব্রুয়ারি ২০১০
প্রকাশক	: স্টুডেন্ট ওয়েজ
পৃষ্ঠা	: ১২০
মূল্য	: ১০০ টাকা

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) একজন প্রখ্যাত বাংলাদেশী কবি। এই বাঙালী কবি 'মুসলিম রেঁনেসার কবি' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাঁর কবিতায় বাংলার অধঃপতিত মুসলিম সমাজের পুর্নজাগনণের অনুপ্রেরণা প্রকাশ পেয়েছে। বিংশ শতাব্দীর এই কবি ইসলামী ভাবধারার বাহক হলেও তাঁর কবিতা প্রকরণকৌশল, শব্দচয়ন এবং বাকপ্রতিমার অনন্য বৈশিষ্টে সমুজ্জল। আধুনিকতার সকল লক্ষণ তার কবিতায় পরিব্যাপ্ত। তাঁর কবিতায় রোমান্টিকতা থেকে আধুনিকতায় উত্তরণের ধারাবাহিকতা পরিস্ফুট।

'সাত সাগরের মাঝি' কবি ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এতে স্থান পাওয়া একটি কবিতার নামও সাত সাগরের মাঝি। ১৯৪৪ সালে কাব্যটি প্রকাশিত হয়। এতে ১৯টি কবিতা রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে

পাঞ্জেরী, সিন্দাবাদ, আকাশ-নাবিক, ডাহুক, এই সব রাত্রি ইত্যাদি। কাব্যটি উৎসর্গ করা হয় বিখ্যাত উর্দু কবি আল্লামা ইকবালকে।

অশিক্ষিত, অবহেলিত ও দুর্দশার পঙ্কে নিমজ্জিত বাঙালী মুসলমানদেরকে উজ্জীবিত করার মানসেই রচিত হয়েছে 'সাত সাগরের মাঝি'। মুসলিম সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবনের অনুষঙ্গগুলি স্বপ্নালোকে ও আদর্শকে রোমান্টিকতা ও আদর্শিকতার সমন্বয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি তার সাত সাগরের মাঝিতে। বাংলা কবিতায় রেঁনেসার যে সুরটি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সৃষ্টি করেছিলেন কবি ফররুখের সাত সাগরের মাঝি তারই পরিপূরক। এ কাব্যে আরবের মরুময়তা ও বিখ্যাত আরব্য উপন্যাস 'আলফা ওয়া লায়লা'র প্রাণস্পর্শী চিত্র ফুটে উঠেছে মনোহরী রূপ দিয়ে। ঐতিহ্য ও আদর্শিকতার এমন সফল সমন্বয় কাব্যজগতে সত্যিই বিরল।

সাত সাগরের মাঝি শীর্ষক অনন্য সাধারণ কবিতার কাহিনী নেয়া হয়েছে আরব্য উপন্যাসের সিন্দাবাদের কাহিনী থেকে। এ কাব্যে সিন্দাবাদ নামেও একটি কবিতা আছে। এটি মুসলিম জাগরণ ও ইসলামী রেনেসাঁর প্রতীক। এ কাব্যে সমুদ্র যাত্রাপথে যে বিভিন্ন অনুষঙ্গ উপস্থিত হয়েছে তাদের রূপ লাবণ্য অত্যন্ত মধুর। নাবিক সিন্দাবাদ ফেনোত্তল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নানা ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌছাবে অর্থাৎ তার উদ্দিষ্ট স্থানে তথা 'হেরার রাজতোরণে' সমবেষ্টিত হবে এটাই প্রতীকী বক্তব্য। মানবতাবাদী কবি আলোচ্য কবিতায় সরাসরি ইসলামের কথা বলেননি। তবে প্রতীকের মাধ্যমে তাঁর আদর্শের এবং লক্ষ্যের কথা বলেছেন।

কবি শামসুর রহমান বলেছেন- "ইসলামী ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে যেসব কবি বিশ্বাসী ফররুখ আহমদ তাঁদের পুরোধা। তাঁর সাত সাগরের মাঝি আমাদের কাব্য সাহিত্যের একটি উজ্জল বই। সর্বপ্রথম হলেও সাত সাগরের মাঝি এখন পর্যন্ত তাঁর সবচেয়ে পরিণত গ্রন্থ। এ কাব্য গ্রন্থেই তাঁর কাব্য শক্তির সবগুলো লক্ষণ বর্তমান। আরবী-ফারসী শব্দের সুনিপুন ব্যবহার করে, পুঁথি সাহিত্যে থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তিনি নিজস্ব একটি ডিকসান তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন।"

রূপসী বাংলা

লেখকের নাম	: জীবনানন্দ দাশ
প্রথম প্রকাশ	: ১৯৫৭
প্রচ্ছদ শিল্পী	: সত্যজিৎ রায়
সংস্করণ	: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬
প্রকাশক	: অবসর প্রকাশনা সংস্থা
পৃষ্ঠা	: ৬৫
মূল্য	: ৫০ টাকা

বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য যখন অনকেটাই পশ্চিমা আদর্শ মুখী তখন বিষয় নির্বাচনে পুরোপুরি স্বদেশ মুখী হয়ে কাব্য চর্চা শুরু করেন জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৬)। ফলে রূপসী বাংলার কবি হিসেবে সুপরিচিতি লাভ করেন। ভাব ও কাঠামোগত দিক থেকে পশ্চিমাদর্শের অনুসারী হলেও তাঁর কবিতা বাংলার প্রকৃতি এবং মানুষের জীবন ও জীবন সংকটের ঘনিষ্ঠ পরিচায়ক।

বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি জীবনানন্দ দাশের সর্বাধিক জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ রূপসী বাংলা। এটি পরম বিস্ময়ের ব্যাপার যে কবি জীবদ্দশায় এ গ্রন্থটি বা এর অর্ন্তভূক্ত কোন কবিতা প্রকাশ করেন নি। মৃত্যুর পর এর পুর্ণাঙ্গ পান্ডুলিপি আবিস্কৃত হয়। পান্ডুলিপিটি সম্পূর্ণ তৈরি বা ফ্রেশ কপি আকারে পাওয়া গিয়েছে। কবি এ কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ নাম নির্বাচন করেছিলেন 'বাংলার ত্রস্ত নীলিমা'। তবে প্রকাশকালে 'রূপসী বাংলা' স্থির করা হয়। কবিভ্রাতা আশোকানন্দ দাশের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় কবি মৃত্যুর তিন বছর পর। এর প্রচ্ছদশিল্পী ছিলেন সত্যজিৎ রায়। পরবর্তীতে জানা যায় ৭৬পৃষ্ঠার রুলটানা খাতার পান্ডুলিপিটিতে ৭৩টি কবিতা ছিল। এর থেকে বাছাই করে ৬১টি কবিতা দিয়ে প্রকাশ করা হয় 'রূপসী বাংলা' কাব্য গ্রন্থ। 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতা দিয়ে শুরু আর 'ভেবে ভেবে ব্যথা পাব' কবিতা দিয়ে শেষ।

কবিতাগুলো লিখিত হয় মার্চ ১৯৩৪ চিহ্নিত একটি পান্ডুলিপির খাতায়। কবিতাগুলো ছিল শিরোনামহীন। লক্ষ করলে দেখা যাবে এ কাব্যগ্রন্থটির প্রতিটি কবিতার শিরোনাম প্রথম পংক্তির প্রথমাংশ দিয়ে। ধারণা করা হয় রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থের নামকরণ এবং উৎসর্গ আশোকানন্দের। এ পান্ডুলিপিটি কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। বাংলার কবিতাগুলো সনেট আকারে লেখা। তবে কবি তাঁর প্রিয় অক্ষরবৃত্ত ছন্দই ব্যবহার করেছেন।

কোন কোন কাব্যগ্রন্থ কবিকে অমরতা দেয়, তাঁর জাত চিনিয়ে দেয়। তেমনি একটি কাব্যগ্রন্থ রূপসী বাংলা। 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থকে কাব্য মনে হয় না। সব মিলিয়ে মনে হয় একটি সম্পূর্ণ কবিতা, একটি চিত্রকল্প। এ কবিতার কেন্দ্রীয় চরিত্র বাংলার প্রকৃতি, জীবনানন্দের অপূর্ব শব্দচয়নে যা হয়ে উঠেছে গভীর অসুখে আক্রান্ত পৃথিবীর শুশ্রুষার মত। আলোচ্য গ্রন্থে শুধু কবির ভাবনার পুস্প-বৃক্ষ-লতা-গুল্মগুলোর একটি সচিত্র রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। শুধু এই কাব্যগ্রন্থ থেকেই অনুমেয় কবি তাঁর ভাবনার ভান্ডারে কত বিচিত্র অনুষঙ্গ এনে জড়ো করেছিলেন। কত বিচিত্রতায় ভরিয়ে তুলেছিলেন তাঁর প্রিয় রূপসী বাংলাকে। আর এভাবেই রূপসী বাংলা হয়ে ওঠে জীবনানন্দ দাশের সমগ্র কবিকৃতিরই মুখচ্ছবি। আমরা যেখানে খুঁজে পাই আত্মপরিচয়ের শিকড় কাহিনী। জন্মমাটির প্রতি ভালোবাসার এক মহৎ সঙ্গীত এখানে উদ্ভাসিত। জীবননান্দ দাশের রূপসী বাংলার কাব্যগ্রন্থে উল্লিখিত প্রায় ৭০টি ফুল-ফল-বৃক্ষ ও লতা-গুল্মের ছবি এবং সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতি স্থান পেয়েছে। একটিমাত্র কাব্যগ্রন্থে বিশাল উদ্ভিদজগতের এমন বিস্তার রীতিমতো বিস্ময়কর। অতি ক্ষুদ্র একটি বুনোফুল থেকে শুরু করে সুবিশাল বট-অশত্থও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। বর্তমান এবং পরবর্তী প্রজন্ম যেন পলিমাটির এসব আত্মজকে খুব সহজেই চিনতে পারে, সে লক্ষ্য থেকেই এই কাব্য। আলোকচিত্রের পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিগুলো এই গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। একই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধিকাংশ পুস্প-বৃক্ষের সমনাম এবং বৈজ্ঞানিকনামগুলো। এ গ্রন্থ একজন কৌতূহলী প্রকৃতিপ্রেমিক থেকে শুরু করে গবেষক- লেখকেরও মনের মাঝে খোরাক জোগাবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এর কবিতাগুলো বাঙালিদের বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। এছাড়া বাংলার প্রকৃতির নিবিড় বর্ণনার মাধ্যমে সবার নিকট প্রকৃতিকে তুলে ধরেছেন। আজও খ্যাত হয়ে আছেন রূপসী বাংলার কবি হিসেবে।

সোনালী কাবিন

লেখকের নাম : আল মাহমুদ
প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৩
সংস্করণ : ২০১২
প্রকাশক : নওরোজ সাহিত্য সম্ভার
পৃষ্ঠা : ৬৫
মূল্য : ৭০ টাকা

তিরিশোত্তর বাংলা কবিতায় এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন কবি আল মাহমুদ। আধুনিক বাংলা কবিতায় তিরিশ দশকীয় প্রবণতার মধ্যেই তিনি ভাটি বাংলার জনজীবন, গ্রামীণ জীবন ও নর-নারীর প্রেম-বিরহকে বিষয় হিসেবে বেছে নেন। লোকজ ও মাটিবর্তী অনুষঙ্গকে তিনি সাবলীলভাবে কবিতায় তুলে ধরেন। আধুনিক বাংলা ভাষার প্রচলিত অবয়বের মধ্যেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আঞ্চলিক শব্দ প্রয়োগ করে কাব্য জগতে নতুন পুলক সৃষ্টি করেন। যা ছিল জীবনানন্দ দাশ কিংবা জসীম উদ্‌দীন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আল মাহমুদ শব্দচয়নে, জীবনবোধে, শব্দালংকারের নান্দনিকতায় ও বর্ণনায় ছিলেন অসামান্য আর ধ্রুপদী। একজন মৌলিক কবি হিসেবে তিনি বাংলা কবিতায় ভিন্ন মাত্রা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মৌলিকত্ব নিজস্ব বাক্‌রীতি প্রবর্তনে ও অসাধারণ সব চিত্রকল্প নির্মাণে। আল মাহমুদের কবি প্রতিভার জোরালো প্রকাশ ঘটেছিল 'সোনালী কাবিন' কাব্যগ্রন্থে। এটিই তাঁর কবি প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করেছিল। ৪৪টি কবিতার সংকলনে এ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো গ্রামীণ আবহে রচিত।

'সোনালী কাবিন' আল মাহমুদের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থে বিভিন্ন শিরোনামের কবিতার সাথে চৌদ্দটি সনেটের সমন্বয়ে সোনালী কাবিন নামে একটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটিকে আলাদাভাবে একটি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থও বলা যেতে পারে। অন্য কবিতাগুলো- জাতিস্মর, পালক ভাঙার প্রতিবাদে, ক্যামোফ্লাজ, শোণিতে সৌরভ, তোমার আড়ালে ইত্যাদি। প্রথম নাম ঠিক করা হয়েছিল 'অবগাহনের শব্দ'। পরবর্তীতে নামটি পরিবর্তন করা হয়।

পুরো কাব্যগ্রন্থটিতে গ্রামীণ আবহে উঠে এসেছে বঞ্চিতের ক্ষোভ, শ্রমিকের ঘাম, কৃষকের পরিশ্রমের কথা। বাদ যায় নি যৌন প্রসঙ্গও। এসবের মধ্যেই তিনি ইতিহাসকে নিয়ে এসেছেন অবলীলায়, তাকে প্রবেশ করিয়েছেন অনুভূতির মাঝে, তার সৌন্দর্যময় শব্দচয়নে। এ মাতৃভূমির ইতিহাস খনন করে

তুলে এনেছেন ঐশ্বর্যময় অনুসঙ্গ। এতে তিনি শক্তিমত্তার সাথে রোমান্টিসিজম প্রবেশ করিয়েছেন। যা সোনালী কাবিন সনেট গুচ্ছকে করেছে অনুপম সৌন্দর্যময়। শুধু তাই নয় কবির কবিতায় ফুটে উঠেছে তার বিশ্বাস। তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার কথাও স্মরণ করেছেন। আর সেই মৃত্যু চিন্তার অনুভূতিগুলো ফুটে উঠেছে বিদগ্ধ শব্দ চয়নে।

বাঙালির আবহমান জীবনযাত্রার প্রামাণ্য দলিল সোনালী কাবিন। শহর এবং নাগরিক যুগপৎ অনুপ্রবেশ এ কাব্যের মহিমাকে সমুজ্জল করেছে। গ্রামীণ শব্দগুলো আল মাহমুদের শিল্পিত হাতের ছোঁয়ায় আধুনিক হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে লুকিয়ে থাকা বাঙালির ঐতিহ্য দানা বেঁধে স্লোগান তুলেছে সোনালী কাবিনে। মানুষ ও মানবতা এ কাব্যের প্রধান বিষয়। প্রেম-ভালবাসার বন্ধন যেমন আছে, তেমনি আছে বিপ্লব-বিদ্রোহের অগ্নি সুর। বাংলাদেশের মাটির গহীন থেকে উঠে আসা গ্রাম্য গন্ধ লেগে আছে এ কবিতাগুলোতে। কবির শাণিত হাতের ছোঁয়ায় মৃত ইতিহাসও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সোনালী কাবিন সম্পর্কে কবি সমালোচক বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বলেছেন- ...বর্তমান অতীতকে ইমারতের মতন গড়ে তোলার জন্য তিনি এক চরিত্র ব্যবহার করেছেন বাঙালী মনোস্বভাবের প্রতিনিধি হিসেবে। ঐ ব্যক্তি বাঙালি, কবি, আবহমান মানুষ, ইতিহাসের মধ্যে হৃদয়ের ইতিহাস গেঁথে দিয়েছেন জনপদ, শস্য, হৃদয় সবই এক মহাসত্যের বিভিন্ন দিক। আর শব্দ আবহমান, চিরকালীন গ্রামীণ এবং লোকজ।...

এ কাব্যগ্রন্থের অসাধারণ কাব্যভাষা গীতল ও অনুভবযোগ্য। বিশেষভাবে সোনালী কাবিন সনেট গুচ্ছে কবি উপমার যে নান্দনিক ব্যবহার করেছেন, তা বাংলা কবিতার জগতকে দিয়েছে নতুন মাত্রা। এ কাব্যগ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ 'গোল্ডেন কাবিন' নামে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত হয়।

মৃত্তিকা সংলগ্ন কবি সত্তার আত্মপ্রকাশ 'সোনালী কাবিন' কাব্যগ্রন্থ। এ কাব্যগ্রন্থ বাংলাদেশের মাটি-মানুষ, জলপথ ও জনপদের জন্ম পরিচয়ের অর্থাৎ বাঙ্গালীর ঠিকানার সন্ধান দেয়। এ কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমেই আল মাহমুদ আমাদের শিকড় খোঁজার পথ চিনিয়ে দিয়েছেন। আর বাংলা কাব্য সম্ভারকে দিয়েছেন সমৃদ্ধতার পূর্ণতা।

আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি

লেখকের নাম : আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
প্রথম প্রকাশ : ১৯৮১
সংস্করণ : ৩য়, ২০১৪
প্রকাশক : অনন্যা
পৃষ্ঠা : ৫৫
মূল্য : ১০০ টাকা

সাতচল্লিশোত্তর বাংলা কাব্যজগতের একজন শক্তিমান কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। তিনি দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আধুনিকতাকে একসঙ্গে সম্মিলিত করেছেন তাঁর কবিতায়। দেশবিভাগ, নতুন জাতীয়তাবোধের চেতনা এবং সেই চেতনার অপমৃত্যুর দংশনে ক্ষত-বিক্ষত কবি হৃদয় সে বেদনার পরিস্ফুটন ঘটান তাঁর কবিতায়। কাব্যিক অভিযাত্রার শুরুতে যে দুঃসহ বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছিলেন তাকে তিনি কবিতার সত্য-উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। মানুষ, প্রকৃতি, ফুল, পাখি, নদী, মা, মানবতা প্রসঙ্গ- শব্দ ব্যবহার করে তিনি জীবনধর্মী কবিতা রচনা করেছেন। লোকজ ঐতিহ্যানুসারে ছড়ার আঙ্গিকে কবিতা রচনা করে এবং শব্দ যোজনার বিচিত্র কৌশলে তিনি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া তাঁর সৃষ্টিশীল কবি প্রতিভার অন্যতম প্রকাশ ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কবিতাগুলো। দেশ, মাটি, মানুষ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কাব্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তাঁর বিখ্যাত এবং অধিক সমাদৃত কাব্যগ্রন্থ 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি'।

'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' কাব্যগ্রন্থে ৩৯টি কবিতা স্থান পেয়েছে। বাঙালি জাতিসত্তার মৃত্তিকামূলে শিকড় সঞ্চার করে এ কাব্যগ্রন্থে কবি ঐক্যবদ্ধ চেতনায় সাহসী-মানুষের সম্ভাবনার ছবি এঁকেছেন। তাঁর এ কবিতা পাঠকের নিকট নতুন স্বাদ ও অভিজ্ঞতা পৌঁছে দেয়। এ কাব্যগ্রন্থ পাঠ করে বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিমান কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন- 'মন্ত্রের মতো অমোঘ উচ্চারণ। এমন কবিতা বাংলা ভাষায় লেখা যায় আমার জানা ছিল না।' এ কাব্যে মানুষ, প্রকৃতি, পল্লী চিত্র, পাখি, ফুল, নদী, মাঠ, রাত্রি, চাঁদ, শৈশব, মানবতা, বিষণ্নতা, প্রতিবাদ, এক অজানা দুঃখবোধ, শাশ্বত হাহাকার প্রবলভাবে স্থান পেয়েছে। যেমন- 'বাঁশি শুনি পাখিদের গান' কবিতায় কবি ও তার মা শৈশবকে স্মরণ করেছেন এক শাশ্বত বেদনার সাথে। এছাড়া আছে ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও মুক্তিযুদ্ধের উজ্জ্বল উপস্থিতি।

এ কাব্যে জন্মভূমি, জন্মভূমির ঐতিহ্য, মা ও কবিতা সম্পর্কে প্রশংসা বাক্য উচ্চারিত হয়েছে। ফলে কবিতাটি দেশ প্রেমের এক অনন্য দৃষ্টান্ত বহন করে। কবির ইচ্ছা থেকে যে সত্যটি আবিস্কার করা যায় তা হলো আনন্দময় উচ্ছ্বাস দ্বারা কবিতাকে ভালবাসতে হবে। কবিতা জীবনে এক অনিবার্য উপকরণ। কবিতা জীবন, সমাজ, রাষ্ট্রে এক সুন্দর অবিসংবাদিত পরিবেশ তৈরি করে।

'কিংবদন্তীর কথা বলছি' কাব্যে কবি বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের প্রতি সুগভীর চেতনার ছাপ ছিল। মায়াবী ভাষায় চিত্রণ করেছেন সেই ছাপকে। যেমন- 'কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা/সজনে ডাঁটায়/ ভরে গেছে গাছটা/ আর আমি ডালের বড়ি শুকিয়ে রেখেছি/ খোকা তুই কবে আসবি? কবে ছুটি?

'কিংবদন্তীর কথা বলছি' কাব্যটি যেন একান্তভাবেই বাঙালি মুসলমানদের সংগ্রামশীলতার ইতিবৃত্ত। এই কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতায় আছে- 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি/আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি/তার বুকে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল।' পিতৃপুরুষের ঋজু ভাবটি বা পলিমাটির সৌরভ বা রক্তজবার মতো ক্ষতের দাগ আমাদের জাতীয় সংগ্রামের এক একটি প্রতীক। পুরো কাব্যে আবহমান বাংলা আর বাঙালির কথা। তাদের জাতীয় রাষ্ট্র উদ্ভবের কথা কবি বলতে চেয়েছেন। সংগ্রামশীল মানুষের সমষ্টিগত চেতনাকে নানা বর্ণের ছবি দিয়ে সাজিয়ে তুলেছেন সহজিয়া ভঙ্গিতে।

বাংলা গদ্য কবিতার অর্ন্তনিহিত শক্তিকে কবি আবিস্কার করেছেন নতুন মাত্রায়। সহজিয়া সুর শব্দ ব্যবহার বা উপমা নির্মাণে তৎসম শব্দকে দিয়েছেন সর্বাধিক গুরুত্ব। ক্রিয়াপদে চলিত ভাষার ধাতুরূপ দিয়ে নির্মাণ করেছেন তার কথকতাকে। এক পর্যায়ে ইতিহাস, নৃতত্ত্ব বা ভৌগোলিক উপাদান গৌণ হয়ে পাঠকের কাছে উদ্ভাসিত হয় কবিতার প্রাণপ্রতিমা। শেষ পর্যন্ত 'কিংবদন্তীর কথা বলছি' আর কথকতা থাকে নি। বাঙালি জাতিসত্ত্বার একটা মহাকাব্যিক ভ্রূণরেখায় রুপান্তরিত হয়ে উঠে। মাতৃবেদনার স্মৃতি দিয়ে শুরু করেছিলেন কাব্য যাত্রা, শেষ অধ্যায়ে এসে নিজেকে উত্তীর্ণ করেছেন জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ার কাব্যকথক রূপে। রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়াকে কবি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের আলোকে ব্যক্ত করেছেন।

কবিতা মানুষের জন্য, জীবনের জন্য, সমাজের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য- এ সত্যকে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই বলা যায় কবি হিসেবে তিনি চিরদিন প্রাসঙ্গিক ও রাজসিক হয়ে থাকবেন। প্রকৃতপক্ষে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ বেঁচে আছেন থাকবেন সন্তান হারা মায়ের শিশির ভেজা চোখে, সাহসী পুরুষের সহিষ্ণু প্রতিক্ষায়, কিংবদন্তীর কথামালায়।

নাটক

নীলদর্পন

লেখকের নাম : দ্বীনবন্ধু মিত্র
প্রথম প্রকাশ : ১৮৬০
সংস্করণ : এপ্রিল ২০০৮
প্রকাশক : অবসর প্রকাশনা সংস্থা
পৃষ্ঠা : ৬০
মূল্য : ১০০ টাকা

উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে বাংলা নাটকের যাত্রা শুরু হয় দ্বীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) হাতে। মানবিকতাবোধ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে তিনি নাটক লেখায় ব্রতী হয়ে রচনা করেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাটক 'নীলদর্পন' (১৮৬১)। সমকালীন সমাজ বাস্তবতায় তাঁর সচেতন বিবেকবোধ তাকে এ নাটক লিখতে বাধ্য করে। জীবন সম্বন্ধে ব্যাপক অভিজ্ঞ এ নাট্যকারের যে সূক্ষ্ম নাট্যশিল্পজ্ঞান তা বাংলা নাট্য সাহিত্যে বিরল। হাস্যরস ও করুণরস উভয়েই ছিল তাঁর সমান দক্ষতা। দ্বীনবন্ধু মিত্র নিপুণ দক্ষতায় এ নাটকে বাংলার কৃষকদের উপর ব্রিটিশ নীলকরদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের স্বরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন।

ইতিহাস স্বদেশিকতা, নীল বিদ্রোহ ও সমসাময়িক বাংলার সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে 'নীলদর্পণে'র যোগ অত্যন্ত গভীর। এই নাটকের পটভূমি নীলচাষের জন্য সাধারণ কৃষকদের উপর ইংরেজ শাসকদের অত্যাচার ও নিপীড়ণ। এতে নীলকর পীড়িত প্রজাদের দুঃখ দুর্দশার বাস্তব করুণচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। দ্বীনবন্ধু মিত্র ঢাকা জেলার পোস্টাল বিভাগের ইন্সপেক্টিং পোস্ট মাস্টার হিসেবে কাজ করার সুবাদে সরকারি কাজে বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। এভাবেই তার নজরে পড়ে গ্রামীণ কৃষকের উপর নীলকরদের অত্যাচার। তিনি লিখেন নাটক নীলদর্পন।

নীলদর্পন নাটকের নাটকের মূল উপজীব্য বিষয় হল বাঙালি কৃষক ও ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রতি নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী। কিভাবে সম্পন্ন কৃষক গোলক মাধবের পরিবার নীলকদের অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে গেল এবং সাধুচরণের কন্যা ক্ষেত্রমণির মৃত্যু হল। তার এক মর্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই নাটকে। তোরাপ চরিত্রটি এই নাটকের অত্যন্ত শক্তিশালী এক চরিত্র। বাংলা সাহিত্যে এর তুলনা খুব কমই আছে। এর মধ্যে দিয়েই শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের বর্বর চরিত্র উদঘাটিত হয়। এই নাটক অবলম্বন করে বাঙালির

স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের সূচনা, এই নাটক সম্বন্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও রায়তদের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন স্থাপিত হয়। আবার বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কথা বলে এই নাটকই প্রথম জাতির জীবনে জাতীয়তাবোধের সঞ্চার ঘটিয়েছিল।

এই নাটকটি তিনি রচনা করেছিলেন নীলকর-বিষধর দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমেঙ্করেণ-পথিক ছদ্মনামে। যদিও এই নাটক তাঁকে খ্যাতি ও সম্মানের চূড়ান্ত শীর্ষে উন্নীত করে। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় নীলদর্পন প্রকাশিত হলে এবং ইংরেজি অনুবাদ প্রচারিত হলে একদিনেই এ নাটক বাঙালি মহলে যতটা প্রশংসিত হয়েছিল, শ্বেতাঙ্গমহলে ঠিক ততটাই ঘৃণিত হয়েছিল। নীলদর্পন নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'A Native' ছদ্মনামে। এই অনুবাদ Nil Durpan or The Indigo Planting Mirror নামে প্রকাশ করেছিলেন রেভারেন্ড জেমস লঙ। অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে দেশে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং জেমস লঙের জরিমানা ও কারাদন্ড হয়। জরিমানার টাকা আদালতেই দিয়ে দেন সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন সিংহ।

এই নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আঞ্চলিক ভাষার সাবলীল প্রয়োগ। কর্মসূত্রে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার যে দক্ষতা দীনবন্ধু আয়ত্ত করেছিলেন। তারই এক ঝলক দেখা মেলে এই নাটকের জীবন্ত চরিত্রচিত্রনে। এই নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ নাটকটির প্রথম দিকের এক প্রদর্শনীতে দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আবেগী ও মেজাজী বিদ্যাসাগর নীলচাষীদের উপর নীলকরদের অত্যাচারের দৃশ্য দেখে এতই ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন যে পায়ের জুতা খুলে ছুঁড়ে মেরেছিলেন অভিনেতার গায়ে। শক্তিমান সেই অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফিও অভিনয়ের সম্মান হিসেবে সেই জুতাকে তুলে নিয়েছিলেন যত্ন করে।

নীলদর্পন নাটকের ইংরেজী অনুবাদ ইংল্যান্ডের পার্লামন্টে প্রেরিত হয়। স্বদেশে ও বিদেশে নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। ফলে সরকার ইন্ডিগো কমিশন বা নীল কমিশন গঠন করতে বাধ্য হন। আইন করে নীলকরদের বর্বরতা বন্ধের ব্যবস্থা করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীকালে এই নাটকের সঙ্গে সেটা এর আঙ্কল টমস কেবিন গ্রন্থের তুলনা করেছিলেন। তা থেকেই বোঝা যায়, সেই সময়কার বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির সমাজ জীবনে এই নাটক কি গভীর বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। সমাজের তৃণমূল স্তরের

মানুষজন জীবনকথা এমনই স্বার্থক ও গভীরভাবে নীলদর্পণ নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। যে অনেকেই এই নাটকে বাংলার প্রথম গণনাটক হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিল।

সামগ্রিকভাবে এই নাটকের কিছু আঙ্গিকগত ত্রুটির উল্লেখ করেছেন সমালোচকগণ। যেমন এই নাটকে চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। বহির্সংঘাতের আধিপত্যে কোনও চরিত্রই বিকাশশীল হয়ে উঠতে পারেনি। নাট্যকাহিনীতেও যথোপযুক্ত জটিলতা না থাকার কারণে নাটকটি দর্শকমহলে তদনুরূপ আগ্রহ ধরে রাখতে পারেনি। সমাজের নিচুতলার বাসিন্দাদের ছবি এই নাটকে অত্যন্ত জীবন্ত হলেও ভদ্রলোক শ্রেণীর চরিত্রগুলোর আচরণ ও সংলাপ এখানে বড়ই কৃত্রিম। এছাড়াও ট্রাজেড়ি রচনায় যে সংযম ও বিচক্ষণতা প্রত্যাশিত, দীনবন্ধু তার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে আতিশয্যের আশ্রয় নিয়ে ফেলেন। ফলে নাটকের অনেক অংশই মেলোড্রামাটিক বা অতিনাটকীয়তার দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। যার কারণে যথার্থ ট্র্যাজেডি হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্যতা হারায় নীলদর্পন। তবে নিঃসন্দেহে নীলদর্পন বাংলা সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটক।

কালিক বাস্তবতায় প্রচন্ড জাতীয়তাবোধ দ্বারা তাড়িত হয়ে দীনবন্ধু এ নাটক রচনা করেন। এটি তাঁর যেমন প্রথম বাংলা সাহিত্যেরও তেমনি প্রথম নাটক। বাস্তবিক অর্থে নাটক রচনার কোন রকম অভিজ্ঞতা (ব্যক্তিগত কিংবা সাহিত্যের ইতিহাসগত) ছাড়াই তিনি এ নাটক রচনা করেন। তা হয়ত আঙ্গিকগত নানা ভুলত্রুটিপূর্ণ ছিল। তবে যে উদ্দেশ্যে তিনি নাটকটি রচনা করেছিলেন সেদিক থেকে পুরোপুরি সফল হয়েছিলেন। সবাইকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে রুখে দিতে পেরেছিলেন ব্রিটিশ নীলকরদের। ভারতীয় স্বাধীকার চেতনার বীজই হয়তো রোপিত হয়েছিল এই নাটকের মাধ্যমে। এছাড়াও এ নাটকের আরও একটি অবদান হল; এর মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল বাংলা নাটকের পথ চলা।

একেই কি বলে সভ্যতা

লেখকের নাম : মাইকেল মধুসূদন দত্ত
প্রথম প্রকাশ : ১৮৬০
সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি, ২০১৩
প্রকাশক : খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি
পৃষ্ঠা : ১১২
মূল্য : ১৫০ টাকা

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সার্থক প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিদ্রোহ ও সংগ্রাম তিনিই সূচনা করেন এবং সর্বোতভাবে সফল হন। মধুসূদন নতুন যুগের আহ্বান উপলব্ধি করেছিলেন- আর তাই বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক আঙ্গিক, ভাব ও বক্তব্যের ক্ষেত্রে তিনি আনলেন জীবন ও জগতমুখী গতিময় পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তনের ধারায় একের পর এক সৃজন করলেন বাংলা সাহিত্যের সব সার্থক ধারা (সনেট, নাটক, ট্রাজেডী, প্রহসন, মহাকাব্য)। উনিশ শতকের সামাজিক সংকট নিয়ে রচনা করলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা'। উনবিংশ শতকের বাংলা প্রহসনসূমহ ছিল সমকালীন সামাজিক সংকট নির্ভর। 'একেই কি বলে সভ্যতা' রচনার প্রেক্ষাপটও সমকালীন সমাজ কাঠামো। এ প্রহসনে দেখানো হয়েছে অন্যের সংস্কৃতির সংযোগে সামাজিক সংকট নতুন পর্যায়ে উপনীত হয়। দেশীয় ও পশ্চিমা এ দুটি সংস্কৃতি থেকেই গ্রহণের কারণে উদ্ভট এক জীবনধারায় অবগাহন করে তখনকার বাঙালির সমাজ জীবন। একেই কি বলে সভ্যতায় দুই সংস্কৃতি ধারণকারী ইয়ং বেঙ্গলদের অনাচার দুরাচারের বর্ণনা রয়েছে। ইয়ং বেঙ্গলদের বেশির ভাগ ছিল বাঙালি নব্য ধণিক শ্রেণীর ছেলে। এরা অনেকেই ইংরেজি শিখেছিলো এবং নিজেদেরকে ইংরেজ করে তোলার প্রাণান্তকর চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। আর এজন্য তারা জামা-কাপড়, খাওয়া-দাওয়া, কথা-বার্তার ঢঙসহ সব ব্যাপারে ইংরেজ সাহেবদের নকল করত। এরা কেউ কোন কাজকর্ম করত না। বাপের পয়সায় আরামে থাকতো আর মদ খেতো। সভা-সমিতিতে যেতো, বড় বড় বক্তৃতা দিতো আর ভাবতো এই হলো সভ্যতা। যারা এসব করে না তার সেকেলে, অসভ্য। এ প্রহসনে মাইকেল ইংরেজী শিক্ষিত ভ্রষ্টাচার (মদ্যপ) তরুণদের কদাচার শাণিত ব্যঙ্গ ভাষায় দারুণভাবে কষাঘাত করেছেন এবং এদের চিন্তা ও ক্রিয়ার সুনিপুণ নকশী কাঁথা বুনেছেন।

তৎকালীন জমিদার বাবুরা গ্রামে প্রজাদের শোষণ করে আয়কৃত অর্থ দিয়ে পুত্রকে কলকাতায় পাঠান শিক্ষিত করে তোলার জন্য। কিন্তু পুত্ররা মোসাহেবদের নিয়ে উৎসব করে বেড়ায়, মদের আসরে বারবিলাসিনীর নূপুরের শব্দ শুনতে যায়, ধর্ম জাত মানবিকতাবোধ আর মানব সম্পর্কের চিরায়ত শৃংখলা হারায় নেশার ঘোরে, ইংরেজ হওয়ার চেষ্টা করে। মধুসূদন এসব চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র প্রধান চরিত্র নবকুমারের মাধ্যমে। কলকাতার আধুনিকতার আলোকে নবকুমার শিক্ষিত হচ্ছে। তার পিতা একজন পরম বৈষ্ণব এবং তিনি বৃন্দাবনেই থাকেন। একসময় তিনি কলকাতায় এসে বসত গড়েন। এই সুযোগে নবকুমার কলকাতার নব্যশিক্ষিত যুবকদের নিয়ে 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে- উদ্দেশ্য মদ্যপান ও বারবণিতা সঙ্গলাভ। একদিন নবকুমারের বন্ধু কালীবাবু নবকুমারের বাড়ীতে এসে ধার্মিক পিতার সাথে মেকি জ্ঞানগর্ভমূলক আলোচনা করে এবং কৌশলে নবকুমারকে বাড়ীর বাইরে নিয়ে আসে। বাইরে আসে মূলত জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় যাওয়ার জন্য। নবকুমারের পিতা সন্দেহপরায়ন হয়ে অনুচর বৈরাগীকে পাঠান রহস্য উদঘাটনের জন্য। তার কাছে সব রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়লে নবকুমার উৎকোচ দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেয়। তারপর জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার কার্যক্রম যথারীতি চলে। নবকুমার অধিক রাত্রে মদ্যপান করে মাতাল হয়ে প্রলাপ বকতে বকতে ঘরে ফিরে। পুত্রের এই পরিণতি দেখে নবকুমারের পিতা কলকাতার বসতি উঠিয়ে নিতে মনস্থ করেন। এই হলো একেই কি বলে সভ্যতার মূল বক্তব্য।

এ প্রহসনে ইংরেজ শাসকদের মুখও খুঁজে পাওয়া যায়। ঘুষখোর ইংরেজ আমলাদের প্রতিনিধি হিসেবে প্রহসনে 'সারজন' চরিত্রটি এসেছে। পরবর্তীতেও আমলাদের চরিত্র বদলায়নি। ইংরেজ শোষণের বুদ্ধিদীপ্ত এবং কৌশলী বর্ণনা হিসেবে একে চিহ্নিত করা যায়। এখানে শুধু আমলাদের কথাই আসে নি, ধর্মের ভেকধারীদেরও কথা এসেছে এবং তা আরো ভয়াবহ। এই প্রহসনের দুটি অঙ্ক এবং প্রত্যেক অঙ্কেই দুটি করে দৃশ্য রয়েছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের স্থান নবকুমার বাবুর গৃহ, দ্বিতীয় দৃশ্যে রয়েছে সিকদার পাড়া স্ট্রিট। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের স্থান জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা, দ্বিতীয় দৃশ্যের নবকুমার বাবুর শয়নমন্দির।

একেই কি বলে সভ্যতা একটি স্বার্থক প্রহসন। প্রহসনের হাস্যরস সম্পূর্ণ ঘটনাগত এবং কৌতুকরসেরই প্রাবল্য দেখা যায়। ঘটনার বাহ্য উদ্ভটত্ব, আকস্মিকতা ও অতিরঞ্জনই প্রহসনের লক্ষণ। হিউমার থাক, আর ব্যঙ্গই থাক প্রহসনের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু প্রবল ও অনর্গল কৌতুক সৃষ্টি করা। এ ক্ষেত্রে মধুসূদন অনবদ্য সাফল্য অর্জন করেছেন।

কৃষ্ণকুমারী

লেখকের নাম : মাইকেল মধুসূদন দত্ত
প্রথম প্রকাশ : ১৮৬১
সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০০১
প্রকাশক : অবসর প্রকাশনা সংস্থা
পৃষ্ঠা : ৭২
মূল্য : ৭০ টাকা

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সার্থক প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিদ্রোহ ও সংগ্রাম তিনিই সূচনা করেন এবং সর্বোতভাবে সফল হন। মধুসূদন নতুন যুগের আহ্বান উপলব্ধি করেছিলেন- আর তাই বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক আঙ্গিক, ভাব ও বক্তব্যের ক্ষেত্রে তিনি আনলেন জীবন ও জগতমুখী গতিময় পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তনের ধারায় একের পর এক সৃজন করলেন বাংলা সাহিত্যের সব সার্থক ধারা (সনেট, নাটক, ট্রাজেডী, প্রহসন, মহাকাব্য)। মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম স্বার্থক ট্রাজেডি নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'। কৃষ্ণকুমারী নাটকটির কাহিনী উইলিয়াম টডের রাজস্থান নামক গ্রন্থ থেকেই নেওয়া। নাটকটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কেশববাবুকে উৎসর্গ করেন।

কৃষ্ণকুমারী বাঙালা ভাষার প্রথম বিয়োগান্ত নাটক। নীলদর্পনের অব্যবহিত পরেই এটি প্রকাশিত হয়। বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয়, দর্শন কষ্টকর ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় বলে সংস্কৃত পন্ডিতগন বিয়োগান্ত নাটক রচনায় নিষেধ করেছেন। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই বিধিনিষেধ মানার পাত্র ছিলেন না। তিনি পাশ্চত্যরীতি অনুসরন করে বিয়োগান্ত নাটক রচনা করেন।

মহারাজা প্রতাপসিংয়ের বংশধর, উদয়পুরাধিপতি মহারাজা ভীমসিংহের দুহিতা কৃষ্ণকুমারী বিষাদময় জীবনের আখ্যায়িকা 'কৃষ্ণকুমারি' নাটকের বিষয়বস্তু। সীতা ও দময়ন্তী যে বংশের কুলবধু, কৃষ্ণকুমারী সেই পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন। লোকে তাকে আদর করে রাজস্থানের কুসুম বলে ডাকত। কৃষ্ণকুমারীর রূপেগুণে মোহিত হয়ে জয়পুরের লম্পটপ্রকৃতির রাজা জগৎসিংহ এবং মরুদেশের অধীশ্বর রাজা মানসিংহ তার পাণিপ্রার্থী হন। তারা উভয়ই প্রতিজ্ঞা করেন যে কৃষ্ণকুমারীকে না পেলে উদয়পুর ধ্বংস করে দিবেন। কৃষ্ণাকুমারীর পিতা ভীমসিংহের অবস্থা তখন এতোই শোচনীয় ছিল যে প্রবল পরাক্রমশালী রাজাদের আক্রমণ থেকে নিজের রাজ্য রক্ষা করার সামর্থ তার ছিল না।

কৃষ্ণকুমারীই সকল সমস্যার মূল মনে করে তিনি কৃষ্ণকুমারীকে হত্যার জন্য আদেশ দান করেন। সরলা কৃষ্ণার প্রাণনাশের কথা যে রাজসভায় গৃহীত হয়েছিল। তা কেউ জনত না এবং এ দায়িত্ব দেওয়া হয় কৃষ্ণার চাচা বলেন্দ্রসিংহের উপর। বলেন্দ্রসিংহ যখন রাতে অস্ত্রসহ কৃষ্ণার কক্ষে প্রবেশ করেন তখন কৃষ্ণা জেগে যায় এবং বলেন্দ্রসিংহের কাছে জানতে চায় যে, তাকে হত্যা করা হোক এ তার পিতারও ইচ্ছা কিনা। বলেন্দ্রসিংহ পরোক্ষভাবে জানায় যে, হ্যা তার পিতারও মত আছে। চারুশীলা কৃষ্ণা বংশের মর্যাদা রক্ষার জন্য বিষপান করে আত্মহত্যা করেন। ইহাই কৃষ্ণকুমারীর ঐতিহাসিক কথা।

ইতিহাসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষ্ণাকুমারীর অভ্যন্তরীণ ঘটনাসূমহ যে রূপ কৌশলে গ্রথিত করেছেন তা সত্যিই অসাধারণ। উদয়পুরের রাজপরিবারের শোচনীয় অবস্থা মধুসূদন অতি সুন্দরভাবে চিত্রায়ন করেছেন। সামান্য কারণে হিন্দু রাজারা মারামারি করে নিজেদের অনিষ্ট করত তার সুন্দর বর্ণনা করেছেন। আধুনিক রাজপুতগণের সভায় বারাঙ্গনাদের অনেক প্রাধান্য ছিল। তারও একটু ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক এই নাটকে।

মধুসূনের নাটকসূমহের মধ্যে কৃষ্ণকুমারীই সর্বোৎকৃষ্ট। এ নাটকে বিভিন্ন চরিত্র চিত্রণে মধুসূদন যে দক্ষতা দেখিয়েছেন। অন্য কোন নাটকে সেরকম দক্ষতা দেখাতে পারেন নি। তবে অন্যান্য নাটকীয় পাত্রের অপেক্ষা উদয়পুরের রাজপরিবারবর্গের চরিত্র চিত্রণেই তার দক্ষতা অনেক বেশি প্রকাশিত হয়েছে। এ নাটকের প্রধান দোষ হল, রাজপুত নরনারীগনের চরিত্র চিত্রিত করতে গিয়ে লেখক স্থানে আপনার স্বদেশীয় নরনারীগণের চরিত্র চিত্রিত করে ফেলেছেন। তার অন্যান্য নাটকের মত চরিত্রগুলোর পূর্ণ অবয়ব চিত্রিত হয় নি এবং এর ভাবও কিছু জায়গায় কৃত্তিমতা দোষে দুষ্ট। কৃষ্ণকুমারী'র সঙ্গীতগুলো মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচিত। কৃষ্ণাকুমারী মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ও তিনি বহন করেন। সবশেষে বলা যায় বাঙালা ভাষায় এ পর্যন্ত যে সকল বিয়োগান্ত নাটক রচিত হয়েছে তার মধ্যে অতি অল্প নাটকই কৃষ্ণকুমারীর সক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। মধুসূদন খুব অল্প সময় সাহিত্য চর্চা করেন, কিন্তু এই অল্প সময়েই তিনি বাংলা সাহিত্যের নানা ধারার সার্থক সূচনা করেন। মধুসূদন তীক্ষ্ণ মেধা ও অসাধারণ সাহিত্যিক দক্ষতায় সমৃদ্ধ করেন বাংলা সাহিত্যকে।

সধবার একাদশী

লেখকের নাম : দীনবন্ধু মিত্র
প্রথম প্রকাশ : ১৮৬৬
সংস্করণ : ২০১০
প্রকাশক : আফসার ব্রাদার্স
পৃষ্ঠা : ১২০
মূল্য : ১০০ টাকা

উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে বাংলা নাটকের যাত্রা শুরু হয় দ্বীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) হাতে। মানবিকবোধ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে তিনি নাটক লেখায় ব্রতী হন। জীবন সম্বন্ধে ব্যাপক অভিজ্ঞ এ নাট্যকারের যে সূক্ষ্ম নাট্যশিল্পজ্ঞান তা বাংলা নাট্য সাহিত্যে বিরল। হাস্যরস ও করুণরস উভয়েই ছিল তাঁর সমান দক্ষতা। আর তাইতো তাঁর হাতে সৃজিত হয়েছে চমৎকার সব প্রহসন। দ্বীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) বাংলা গদ্য সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

আলোচ্য এ প্রহসনে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুরা পান এবং বেশ্যাবৃত্তি যুবকদের জীবনে যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল সেই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে ইয়ং বেঙ্গল সমাজের অধঃপতনের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ডাক বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন। কর্মসূত্রে যখন তিনি ভারতের নদীয়া ও উড়িষ্যা এবং বাংলাদেশের ঢাকা এই তিনটি জেলার পোস্টাল বিভাগের ইন্সপেক্টিং পোস্ট মাস্টার নিযুক্ত তখন তিনি এ প্রহসনটি রচনা করেন। এটি একটি প্রহসন নাটক। এটি নাতিদীর্ঘ। এতে তিনটি অঙ্ক রয়েছে। প্রথম অঙ্কে ২টি, দ্বিতীয় অঙ্কে ৪টি এবং তৃতীয় অঙ্কে ৩টি গর্ভাঙ্ক রয়েছে।

এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র অটল। সে ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্তান। তার প্রচুর বন্ধু-বান্ধব। অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তাকে কুপথে পরিচালিত করে। সে মদে আসক্ত হয় এবং বেশ্যালয়ে গমন শুরু করে। সে কাঞ্চন নামীয় এক বেশ্যাকে স্বগৃহে রক্ষিতা হিসেবে রাখতে উদ্যত হয়। অটলের পিতা পুত্রের এহেন অনাচারে আপত্তি করেন। কিন্তু অটলের মা পুত্র হারানোর ভয়ে রক্ষিতার ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করে। অটলে বন্ধু-বান্ধব বিশেষ করে নিমচাঁদ এসব কর্মকান্ডে তাকে সাহায্য করে। এক পর্যায়ে কাঞ্চন অটলকে পরিত্যাগ করে। অটলের বন্ধুরা মানুষের হাতে নিগৃহীত হয়।

এ নাটকের মাধ্যমে তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজের উচ্চশ্রেনীর ব্যক্তিবর্গের চাল-চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মদ্যপানের কুফল ফুটিয়ে তোলা এ নাটকের অন্যতম উদ্দেশ্য। মদ্যপানের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সমাজের বেশ্যাশক্তির বিষয়টি তোলা হয়েছে। মদপান এবং বেশ্যাশক্তির কারণে সে সমসাময়িক সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং নৈতিক অধঃপতন দেখা গিয়েছিল তার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো হয়েছে। উঠতি ধনী ব্যক্তিরা অর্থ ও বিত্তের জোড়ে বিজাতীয় সংস্কৃতিকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে যে অনাসৃষ্টি করে তারই একটি বিশ্বস্ত রূপ সধবার একাদশী।

এ নাটকটির ভাষা এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। পরিবেশের দাবী অনুযায়ী বিভিন্ন সংলাপের পর্যাপ্ত ব্যবহার দেখা যায়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের একেই কি বলে সভ্যতার আদর্শে দ্বীনবন্ধু মিত্র সধবার একাদশী লিখেছেন।

সধবার একাদশীতে তৎকালীন সমাজের উচ্ছৃঙ্খল দিকটি তুলে ধরার কারণে প্রশংসা লাভ করেছিল। তবে প্রহসনটি কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ ছিল। এই প্রহসন বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত নহে, এই জন্য দ্বীনবন্ধু মিত্রকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে এর বিশেষ পরিবর্তন ব্যতীত যেন প্রচার না করা হয়। কিন্তু তিনি বেশিদিন এই অনুরোধ রক্ষা করেন নি। ১৮৮৬ সালে নভেম্বর মাসে যখন বেঙ্গল পত্রিকায় প্রথম মুদ্রিত হয়। বেশ্যা ইত্যাদি বিষয়-বস্তুর জন্য অনেক বিরূপ সমালোচনার মুখে পরে। তবে সবকিছু ছাপিয়ে এটি পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। পাশাপাশি সমকালীন সমাজ বাস্তবতার স্বরূপচিত্র বলে সাহিত্য ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হিসেবে বিবেচিত।

জমিদার দর্পন

লেখকের নাম : মীর মশাররফ হোসেন
প্রথম প্রকাশ : ১৮৭৩
সংস্করণ : ১ম, ২০০৭
প্রকাশক : দি স্কাই পাবলিশার্স
পৃষ্ঠা : ৭০
মূল্য : ৬০ টাকা

বাংলা সাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম বাঙ্গালী লেখকদের মধ্যে অগ্রজ। সমকালীন বাঙালী লেখকদের মধ্যে তিনি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। উপন্যাস, কাব্য, নাটক এবং নানারকম গদ্যরচনা অর্থাৎ কথাসাহিত্যের প্রায় সব শাখায়ই ছিল তার মুখর পদচারণা। ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। সমকালীন সমাজ বাস্তবতায় তাঁর সচেতন লেখক সত্তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'জমিদার দর্পন'(১৮৭৩) নাটকটি। এ নাটকে তিনি সাধারণ মানুষের উপর জমিদার শ্রেনীর নির্মম অত্যাচারের স্বরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন নিবিড় বীক্ষনের মাধ্যমে।

এ নাটকে নাট্যকার সমাজকে বিধৃত করেছেন স্থপতির মতো। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পনের সাথে জমিদার দর্পনের নামকরনে যেমন মিল পাওয়া যায় তেমনি রয়েছে ভাবগত মিল। নীলদর্পনে জনগণের প্রতি নীলকরদের আর এ নাটকে জমিদারদের অত্যচারের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। জমিদার দর্পনের প্রতিপাদ্য বিষয় জমিদার শ্রেণীর উৎপীড়ন। এ নাটকের কাহিনী সরল ও আড়ম্বরহীন। অত্যাচারী ও চরিত্রহীন জমিদার হায়ওয়ান আলীর অত্যাচার এবং অধীনস্ত প্রজা আবু মোল্লার গর্ভবতী স্ত্রী নূরুন্নেহারকে ধর্ষণ ও হত্যার কাহিনী জমিদার দর্পনের মূল ঘটনা। জমিদার শ্রেনীর চরিত্র, তোষামোদের চলচাতুরী, চাষা আবু মোল্লা এবং তার পত্নী নুরুন্নেহারের নির্যাতন প্রভৃতি নিয়ে জমিদার দর্পন অতি বাস্তবধর্মী নাট্যকর্ম। বিচারালয়ে ইংরেজ জজ-ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার, দেশি দারোগা, উকিল মুক্তার সবই তৎকালীন সমাজের প্রতিনিধি। আর এসব চরিত্রের সমন্বয়ে যে নৈরাজ্য চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা বাস্তবতার দিক থেকে অতুলনীয়।

নাটকের কাহিনী হচ্ছে- কৃষক আবু মোল্লা ও তার সুন্দরী স্ত্রী নুরুন্নেহারের সুখী সংসার। কিন্তু জমিদার হায়ওয়ান আলীর কুনজর পরে নুরুন্নেহারের উপর। যে কোন মূল্যে সে নুরুন্নেহারকে পেতে চায়। তাই কৌশলে সে আবু মোল্লাকে সর্বসান্ত করে শেষ পর্যন্ত মিথ্যা মামলায় জেলে পাঠায়। অন্তঃসত্তা নুরুন্নেহার বাধ্য হয়ে স্বামীর নিষ্কৃতির জন্য হায়ওয়ান আলীকে অনুরোধ করতে তার নিকট যায়। গিয়ে তাকে বাবা বলে সম্বোধন করে। কিন্তু পশুর থেকেও অধম হায়ওয়ান আলী তার পাশবিকতা চরিতার্থ করার জন্য সচেষ্ট হয়। আর এই ধর্ষনের ফলে অন্তঃসত্তা নুরুন্নেহারের অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ জনিত কারনে মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুর দায় এড়াতে হায়ওয়ান আলী ব্রিটিশ শাসকদের উৎকোচ প্রদান করে। আর তাকে মৃত্যুর দায় থেকে বাঁচাতে জঘন্যভাবে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ব্রিটিশ ডাক্তার, পুলিশ ও বিচারক সবাই সব রকম সহায়তা করে। তারা উল্টো স্বামী আবু মোল্লাকেই খুনী সাব্যস্ত করতে চায়। এভাবে এ নাটকে মীর মশাররফ জমিদার ও শাসকশ্রেণীর দালালদের ঘৃণ্য চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

সাহিত্যে ও শিল্পকর্মে সাধারণত অপরিচিত বেদনার কথা বেশিদৃষ্টিগোচর হয় না। আবু মোল্লা আর নুরুন্নেহারের জীবন দান বিরাট সংবাদ ভাষ্যের অন্তর্ভূক্ত হবে না। কিন্তু তাদের মৃত্যুর ব্যঞ্জনা কোনভাবেই তুচ্ছ হবার বিষয় নয়। জমিদার দর্পন নাটকের প্রধান চরিত্রে পরিনাম ও অসহায় জীবনভাগ্য নাটকটিকে ট্রাজেডির মহিমা দান করেছে। মীর মশারফ হোসেন ছিলেন বাস্তববাদী ও জীবনমূখী নাট্যকার। জমিদার দর্পন নাটকে সে দৃষ্টান্ত উজ্জল। মীর মশারফ নিজেই লিখেছেন নাটকটির কিছুই সাজানো নয়। অবিকল ছবি তুলে ধরা হয়েছে সমাজের।

জমিদার দর্পনে শিল্পী তার অন্তর্নিহিত সত্য প্রকাশে উৎকণ্ঠিত নন, তার বক্তব্য ছিল সামাজিক সমস্যা বিষয়ক। শাসক শাসিতের সম্পর্কের হৃদয়হীনতাকে তিনি তুলেছেন মর্মস্পর্শী ভাবে। নীলকরদের সম্বন্ধে তুলে ধরা নীলদর্পনের যেমন উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ জামিদার সম্বন্ধে অনুরুপ বক্তব্য ছিল মীর মশারফ হোসেনের। জমিদার দর্পনের পরিসরে তুলে ধরেছেন দুর্বল প্রজাদের ওপর জমিদারদের অত্যাচার নিপীড়নের কাহিনী। বঙ্কিম বাংলার জমিদারদের লক্ষ্য করে বলেছেন- জীবের শত্রু জীব, মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য, বাঙালি কৃষকদের শত্রু বাঙালি ভূস্বামী।' জমিদার দর্পনে এটাই লক্ষ্য করা যায়।

শুধু জমিদার নয়, তারা যে ব্রিটিশ শাসকদের তোষামোদ করত সেই শাসকদের চরিত্রও নাট্যকার উন্মোচন করেছেন। শাসকদের দোসর রূপে ইংরেজ ডাক্তার,

বিচারকের চরিত্র তুলে ধরেছেন। এরা নির্লজ্জ দায়িত্বহীন সরকারি কর্মচারীদের প্রতিভূ। এছাড়া আছে জিতু মোল্লা ও হরিদাস বৈরাগীর ধড়িবাজ বকধার্মিক চরিত্র।

নাটকে ভাষার শৈল্পিক গুণ লক্ষ্য করা যায়। ওই সময় বাংলা সাহিত্য চর্চায় কম মুসলমানই এগিয়ে এসেছিল। এরই প্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্র মীর মশাররফের ভাষা সম্পর্কে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় নাটকটির প্রশংসা করে লিখেছেন, 'অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালার অপেক্ষা এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ। এটি তার সবচেয়ে উজ্জল ও বস্তুনিষ্ঠ নাটক। এটি নির্মানে স্বার্থক নাট্যকারের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলাদেশের জমিদারি শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এমন প্রচন্ড আঘাত ইতিপূর্বে অন্য কোন সাহিত্যিকের রচনায় পাওয়া যায় না। এটি মীর মশাররফের সমাজ চেতনার বিস্ময়কর পরিচয়। সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত জমিদার দর্পন উনিশ শতকের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্মই নয় একটা দলীল বিশেষ। মীর মশাররফের এ সাহসী কর্ম কেবল সাহিত্য কর্মে নয় আজও সমাজের শোষক, লম্পট অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শৈল্পিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এ নাটক কালোত্তীর্ণ শিল্পের মর্যাদায় অভিষিক্ত।

ডাকঘর

লেখকের নাম	: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রথম প্রকাশ	: ১৯১২
সংস্করণ	: ২০১৪
প্রকাশক	: আফসার ব্রাদার্স
পৃষ্ঠা	: ৯৫
মূল্য	: ৮০ টাকা

বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) হাতেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ও সমৃদ্ধি। বাংলা কাব্যে এবং কথাসাহিত্যের সব শাখায়ই তিনি অবাধে বিচরণ করেছেন। মোটকথা তাঁর দূরদর্শী দার্শনিকতা ও অনবদ্য সাহিত্যিক দক্ষতায় তিনি বাংলা সাহিত্যকে করেছেন ঋদ্ধ। তাঁর লেখায় মানবতাবোধ, রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজচিন্তা, দুরদর্শিতা ও অধ্যাত্মবোধ প্রখরভাবে প্রতিফলিত। তাঁর বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার বাঙ্গালীর অমূল্য সম্পদ।

মানবজীবনের প্রায় সব দিকই তাঁর লেখায় কোন না কোনভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। কখনো হয়েছে স্পষ্টভাবে কখনো বা প্রতীক রূপকের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত রূপক সাংকেতিক নাটক 'ডাকঘর' (১৯১২)। এই নাটকের বিষয়বস্তু বিশ্বাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার যুক্ত হওয়ার পরম আকাঙ্ক্ষার গূঢ় তত্ত্ব।

আলোচ্য এ নাটকের নায়ক ঘরের মধ্যে বন্দি বালক অমল। তাঁরই ক্ষয় অবসন্নতা ও মৃত্যুর ঘটনাই নাটকের বিষয়বস্তু। আট বছর বয়সী অমল অসুস্থতার কারনে ঘরবন্দী। কবিরাজ তার আয়ু বেশি দিন নেই বলে মনে করছে। এমনই এক প্রেক্ষাপটে মৃত্যুভয় থেকে মুক্তি আর জীবনকে ভালবাসার মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠে ডাকঘরের অমল। জানালার সামনে বসে থেকে তার দিন কাটে। কিন্তু তার মন সেই চার দেওয়ালের গন্ডি পার করে ডানা মেলে সুদূর আকাশে উড়তে চায়। অমলের সেই মনপাখিকে উড়িয়ে নিয়ে যায় তাঁর প্রিয় দইওয়ালা। তার সঙ্গে গলির আকে বাঁকে ঘুরতে থাকে অমলের স্বপ্নালু চোখ। কবিরাজের বারণ মানতে সে আর স্কুলে যেতে পারে না। তার বন্ধু হয়ে উঠে জানালার সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করতে থাকা ফুলওয়ালির মেয়ে সুধা কিংবা বাইরে খেলতে যাওয়া ছেলেরা। সে তাদের মধ্য দিয়ে খুঁজে নেয় তার মনের মনিকোঠায় বেঁধে রাখা বেঁচে থাকার স্বাদ। দ্বাররক্ষীর কাছে সে শোনে পোষ্ট অফিসের গল্প। সে স্বপ্ন দেখে পোস্ট মাষ্টার হওয়ার এবং সে অপেক্ষা করতে থাকে রাজার চিঠির। এদিকে কবিরাজের ঔষুধ তার শরীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে চলেছে ক্রমশ। নতুন কবিরাজ এসে সব দরজা জানালা খুলে দিতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু তাতেও আর অমলকে ধরে রাখা সম্ভবপর হয় না।

নাটকে দূরে যাওয়ার ইচ্ছা অমলের মনটাকে দেখায়, আর তার রোগের বর্ণনা তার শরীরের চেহারাটা দেখিয়ে দেয়। সুদূরের জন্য পিপাসিত চিত্তের অমলের ধারণা সে একদিন বাইরের জগতে যাবে। একদিন তার নামে রাজার চিঠি আসবে। বিষয়ী লোকেরা তার কথায় পরিহাস করত। কিন্তু সত্যি সত্যি একদিন রাজা এলেন। অপরূপ সংলাপ, প্রকৃতি ও জীবনের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা, এক সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতা এবং সংকেতময়তা এই নাটকটির সার্থকতার মূল। একটি শিশুকে কেন্দ্র করে এমন গীতিময় নাটক রচনা সাহিত্যে বিরল।

এ নাটকে কোন গল্পের ফাঁদ নেই, নেই কোন নাটকীয়তার ভান। একান্ত সংলাপ-সর্বস্ব এ নাটকে ঘুরেফিরে অমলের বন্দীদশা এবং তার মুক্তির চিন্তাই এসেছে। রবীন্দ্র নিজে বলেছেন : এর মধ্যে গল্প নেই। এ গদ্য লিরিক। নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হল- অমল, ঠাকুর্দা, সধা, দৈওয়ালা প্রমুখ।
এ নাটকের প্রতীকি ব্যঞ্জনায় এসেছে মুক্তির কথা। রাজার ডাকঘর, ডাকঘরের নানা ডাকহরকরা এবং তাদের বয়ে নিয়ে আসা রাজার চিঠি, সবই এই প্রতীকের অঙ্গ। ডাকঘরের অমলকে আলাদা করে চেনার দরকার নেই। আমাদের সমাজে অমলরা আজোও বিরাজমান। কালাতিক্রম করে এই অমলেরা সমাজ নামক বেড়াজালে বাঁধা পড়ে প্রতিনিয়ত। আমাদের প্রতিটি ঘরেই একজন করে অমল বেড়ে উঠছে। পাড়ার বন্ধুদের সাথে খেলা কিংবা স্কুল ফেরত মাঠে খেলতে যাওয়া এসব এখন প্রায় রূপকথা হতে বসেছে। একুশ শতক তাদের কল্পনা যতই কোচিং আর ছকে বাঁধা জীবনে বেধে ফেলতে চায়, ততই যেন হাইরাইজের মাথা টপকে তাদের কল্পনায় ভর করে আসে পাহাড়ের গা বেয়ে চলা নদীর কথা।
বড়দের জন্য অনেক নাটক থাকলেও ছোটদের বাংলা সাহিত্যে তেমন নাটক নেই। তবে এ যাত্রায় তাদের রক্ষা করেছে বাংলা সাহিত্যের সব সময়ের শেষ ভরসা কবিগুরু বরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যে ভান্ডার।

রক্তকরবী

লেখকের নাম	: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রথম প্রকাশ	: ১৯২৬
সংস্করণ	: অক্টোবর ২০১৪
প্রকাশক	: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা
পৃষ্ঠা	: ১২০
মূল্য	: ১৪০ টাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) রচিত 'রক্তকরবী' একটি সাংকেতিক নাটক। এই নাটকে রূপায়িত হয়েছে মানুষের লোভ কিভাবে জীবনের সব সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করে মানুষকে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণে তথা নিছক যন্ত্রে পরিণত করে এবং তার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ কিরূপ ধারণ

করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন, 'যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত'।
নাটকের সংক্ষিপ্ত কাহিনী- যক্ষপুরীর রাজার রাজধর্ম প্রজাশোষণ, তার অর্থলোভ দুর্দম। তার সে লোভের আগুনে পুড়ে মরে সোনার খনির কুলিরা। রাজার দৃষ্টিতে কুলিরা মানুষ না, তারা স্বর্ণলাভের যন্ত্র মাত্র। তারা যন্ত্রকাঠামোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ মাত্র। মানুষ হিসেবে তাদের কোন মূল্য নেই। এখানে মনুষ্যত্ব, মানবতা এ যন্ত্রবন্ধনে পীড়িত ও অবমানিত। জীবনের প্রকাশ যক্ষপুরীতে নেই। যক্ষপুরীর লোহার জালের বাইরে প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক নন্দিনী সবাইকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। এক মুহূর্তে সবাই চঞ্চল হয়ে উঠল। রাজা নন্দিনীকে পেতে চাইলেন যেমন করে সোনা আহরণ করেন, শক্তির বলে কেড়ে নিয়ে। কিন্তু প্রেম ও সৌন্দর্য এভাবে লাভ করা যায় না। নন্দিনী রঞ্জনকে ভালবেসে তাই তার মধ্যে প্রেম জাগিয়ে তুলেছে। কিন্তু রঞ্জন যন্ত্রের বন্ধনে বাধা। এ যন্ত্র তার প্রেমকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল এটাই যান্ত্রিকতার ধর্ম।
নাটকে নন্দিনী আনন্দের দূত রূপে দেখা দিয়েছে নিপীড়িত মানুষের মাঝখানে। রঞ্জন বিদ্রোহের বাণী বহন করে এনেছে। শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে মানুষের প্রাণশক্তি। বাইরে বেরিয়ে এসেছে জালের আড়াল থেকে যক্ষপুরীর রাজা। রক্তকরবীতে ধনের উপর ধান্যের, শক্তির উপর প্রেমের এবং মৃত্যুর উপর জীবনের জয়গান গাওয়া হয়েছে।
'রক্তকরবী' শুধু রূপক নাটক নয়। এর শ্রেণী আঙ্গিক বিচার প্রয়োজন। কারন এ নাটকে আমরা একটি অরূপ, অন্তরের ইঙ্গিতও লাভ করি। যা আত্ম উপলব্ধির সম্পদ। যা বাক্যে ও জ্ঞানে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ নাটক বরীন্দ্রনাথের আত্মসাধনার ফসল। প্রথমত রক্তকরবীতে সাংকেতিক বস্তু বা প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত অরূপের অসীম রহস্যের অর্থ রক্ত করবীর সারা দেহে ছড়িয়ে আছে। বিশেষত রঞ্জনের দুর্জেয় অস্পষ্টতা, নন্দিনীর অলৌকিক ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনা এবং বিশু পাগলার দুঃখ সাধনার অতীন্দ্রিয় আনন্দ বাদে বিধায়তার চিন্তার রহস্য লীলার সংকেত স্পষ্ট। রক্তকরবী নাটকে অরূপের মধ্যে রূপের লীলা আছে। এ নাটকে আলো, রঙ ও সুরের স্পর্শ আছে। উল্লেখিত-তিনটি গুনের উৎপত্তিস্থলও হচ্ছে হীন জগতে।

রক্তকরবী নাটকের সর্বত্র অরূপকে রূপ দেওয়ার ইচ্ছা। অসীমকে পাওয়ার আকুতি। অতীন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়ের মাঝে ধারণ করার আয়োজন। এজন্যই যথার্থ অর্থেই সাংকেতিক নাটক। সাহিত্যের বিচার বিশ্লেষণে রক্ত করবীকে সাংকেতিক নাটকের শ্রেণীতে আবদ্ধ করা হয়েছে। নাটকের তত্ত্ববস্তু ও নাট্য সংঘাতের মূলে রয়েছে একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব। যে দ্বন্দ্ব প্রাণ ধর্মের সাথে জড় ধর্মের। দ্বন্দ্বটি অবশ্য সব নাটকে বর্তমান। নন্দিনী কবি হৃদয়ের মানসমূর্তি। মুক্তির বানীকে সে বহন করে এনেছে। এ নাটকে মুক্তির আনন্দ নন্দিনীর মাঝে আমরা প্রত্যক্ষ করি।

নবান্ন

লেখকের নাম : বিজন ভট্টাচার্য
প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৪
সংস্করণ : ২০১২
প্রকাশক : বুকস্ ফেয়ার
পৃষ্ঠা : ১৯৫
মূল্য : ১৭৫ টাকা

নবনাট্য আন্দোলনের আন্দোলনের প্রথিকৃৎ বিজন ভট্টাচার্য (১৯০৬-১৯৭৮) নবান্ন নাটকের মাধ্যমে বাংলা নাট্যধারায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাই এই নাটকটিকে বাংলা নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে যুগান্তকারী বলা চলে। নবান্ন পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় কৃষক জীবনের দুঃখ, দুর্দশা ও জীবন সংগ্রামের কাহিনী অবলম্বনের রচিত নাটক। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলায় প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ অনাহার, অপুষ্টি ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এরই নাট্যরূপ 'নবান্ন' নাটক।

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রধান সমাদ্দার। তিনি বাংলার একজন চাষি। পঞ্চাশের মন্বন্তরে প্রধান সমাদ্দারের পরিবার দুঃখ দুর্দশাই এই নাটকের বিষয়বস্তু। অনেকে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পনে'র সঙ্গে এর তুলনা করেছেন। এ নাটকটি ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ ১৯৪৪ সালে প্রথম অভিনয় করে। তখন থেকেই 'নবান্ন' নতুন বাংলা নাটকের অগ্রদূত রূপে গন্য। পঞ্চাশের মন্বন্তর, সমকালীন জাতীয়

আন্দোলন, মেহনতি মানুষের চাহিদা ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ কৃষক সমাজে দুঃখ, দুর্দশা, তাদের সংগ্রাম, সফলতা-ব্যর্থতা ইত্যাদি এই নাটকের মূল সুর।

নবান্নের প্লট সম্পর্কে নাট্যকার নিজেই বলেছেন- 'একদিন ফেরার পথে কানে এলো পার্কের রেলিঙের ধারে বসে এক পুরুষ আর এক নারী তাদের ছেড়ে আসা গ্রামের গল্প করছে, নবান্নের গল্প, পুজো পার্বণের গল্প। ভাববার চেষ্টা করছে তাদের অবর্তমানে গ্রামে তখন কি হচ্ছে।' তার অভিজ্ঞতার ভেতর থেকেই এই নাট্যরূপ উঠে এসেছিল।

১৯৪৩ সালে অভিভক্ত বাংলায় দেখা দিলো এক ভয়ঙ্কর মন্বন্তর। লাখ লাখ লোকের মৃত্যু হল। মুখিয়ে উঠল চারদিকে সামাজিক অবক্ষয়। অভিভক্ত বাংলার যন্ত্রণা নিংড়ে জন্ম নিল সামাজিক সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামের গভীর থেকে বিজন ভট্টচার্যের আত্মপ্রকাশ নাট্যকার রূপে। সেই সময়টাতে অধিকাংশ নাটকের কাহিনী ছিল প্রধানত রাজরাজাদের কাহিনী, পুরান ও ইতিহাসের চর্বিত চর্বন। সেখানে মধ্যবিত্ত জীবনের গুটিকয়েক কল্পিত সমস্যা ছাড়া ব্যাপকভাবে জনজীবনের চিত্র অঙ্কিত হয় নি।

১৯৪৩, ৪৪ সালে ভারত বর্ষের অনেকগুলো অঞ্চলে খাদ্যাভাব ও দুভিক্ষ দেখা দেয়। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার কিছু কিছু জায়গায় তা মারাত্মক রূপ ধারণ করে। এ দুর্ভিক্ষের জন্য স্থানীয় উৎপাদন ঘাটতি অপেক্ষা ব্রিটিশ প্রশাসনের দুর্বল বন্টন ব্যবস্থা এবং অজন্ম সত্ত্বেও অব্যাহত শস্য রপ্তানিই অধিকতর দায়ী। এই সময়ে ভারতের ৪০ লাখ টন শস্য ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও ১০ লাখ টন শস্য রপ্তানি করা হয়। ফলে শস্যের দাম মারাত্মকভাবে বাড়তে থাকে, যার প্রথম বলি হয় ভারতীয় সমাজের দরিদ্র মানুষ। সুবিধাবাদীরা ও চোরাকারবারিরা ইচ্ছেমত নিজেদের সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। এ যেন প্রাকৃতিক বিপর্যয় আর মনুষ্য সৃষ্ট সংকটের জাতাকলে পিষ্ট মানবতা। যে মানুষেরা রাস্তায় দুর্ভিক্ষের মড়া দেখে মুখ ফিরিয়ে গেছে 'নবান্ন' নাটক দেখিয়ে সেই মানুষের চোখে জল ঝড়াতে পেরেছে। এটাই ছিল লেখকের স্বার্থকতা।

'নেমেসিস'

লেখকের নাম	: নুরুল মোমেন
প্রথম প্রকাশ	: ১৯৪৮
সংস্করণ	: ১ম, ২০০৯
প্রকাশক	: দি স্কাই পাবলিশার্স
পৃষ্ঠা	: ৮০
মূল্য	: ৭৫ টাকা

চল্লিশের দশকের পরের বাংলা আধুনিক নাটক ও রম্যরচনার পথিকৃত নাট্যগুরু নুরুল মোমেন (১৯০৬-১৯৯০)। তৎকালীন বাংলাদেশের রক্ষনশীল সমাজে নাটক ও অভিনয় শিল্পকলার সামাজিক স্বীকৃতির জন্য তিনি অনেক কষ্ট করেছেন। এজন্য তাকে নাট্যগুরু উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সমকালীন সমাজের অসঙ্গতি ও দ্বন্দ্বকে নুরুল মোমেন ব্যঙ্গরসের মাধ্যমে নাটকে তুলে ধরেন। তাঁর নাটকে সমাজিক পটভূমিকায় দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় চরিত্রগুলো সাবলীলভাবে প্রতাশিত। সজাগ অনুভূতি, তীক্ষ্ণ রসবোধ ও বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপেই নুরুল মোমেনের নাটকের বিশিষ্টতা। নুরুল মোমেনের শ্রেষ্ঠ নাটক 'নেমেসিস'। এটি বাংলাদেশের প্রথম নিরীক্ষামূলক নাটক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ১৯৪৪ সালে তিনি নাটকটি লিখেন কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৪৮ সালে।

নেমেসিস নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র স্কুল মাষ্টার সুরজিত নন্দী। নাটকের কাহিনীতে দেখা যায়- সুরজিত নন্দী ধনী নৃপেন বোসের কন্যা সুলতাকে ভালবেসে বিয়ে করতে চায়। নৃপেন বোস বিয়ের পূর্বশর্ত দেয় তিন মাসের মধ্যে সুরজিতকে পাঁচ লাখ টাকা উপার্জন করতে হবে এবং ঐ সময় সুলতা তার পিতৃগৃহেই অবস্থান করবে। সুরজিত এ শর্তে সুলতাকে বিয়ে করতে রাজি হয়। শর্ত পূরণের জন্য সে নৃপেন বোস ও তার সহযোগী অসীমের সহায়তায় যুদ্ধের বাজারে কালো টাকা উপার্জনের সুড়ঙ্গ পথ আবিস্কার করে। কিন্তু বিবেকের দংশনে পীড়িত হয় সুরজিত। অর্ন্তজ্বালায় ক্ষত-বিক্ষত সুরজিত শেষ পর্যন্ত বিবেকের সাথে আপোষ করতে পারে নি। বিজয় মুহূর্তে সুরজিতের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাটকের কাহিনী শেষ হয়।

'নেমেসিস' গ্রিক দেবী। প্রতিহিংসার দেবী নেমেসিস। তার হাতে মানুষের ভাগ্য যা মানুষ ইচ্ছা করেও অতিক্রম করতে পারে না। নাটকে সুরজিত ইচ্ছে করেও তার ভাগ্যলিখন অতিক্রম করতে পারে না। সুরজিতের মধ্যে ট্র্যাজেডির নায়কের দ্বন্দ্ব সংঘাত কার্যকর। শেষে সে মৃত্যুবরণ করে। এ নাটকে সমকালীন

দুর্ভিক্ষ মজুতদারদের পিশাচবৃত্তি ও নিরন্নদের হাহাকারের বাস্তবচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এখানে প্রতিহিংসার দেবী প্রতীকী ব্যঞ্জনায় আঁকা হয়েছিল।

নেমেসিস এক চরিত্রের একটি ট্রাজেডি। বিশ্ব নাটকের ৩০০০ বছরের ইতিহাসে তার আগে এক চরিত্রের নাটক লেখা হয়েছে মাত্র দুটি। আলোচ্য এ নাটকের একমাত্র চরিত্র সুরজিত নন্দী। তবে অদৃশ্য চরিত্র হিসেবে আছে নৃপেনের বোন, তার কন্যা সুলতা, ম্যানেজার অসীম, অমল বাবু, ইয়াকুব প্রমুখ। এ নাটকের সংলাপে নাট্যকরের ধীশক্তির পরিচয় স্পষ্ট। নেমেসিস নাট্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ অংকন করেন নাট্যকার নিজেই। এটি বাংলাদেশের পরাবস্তব চিত্রকলা।

মোহিতলাল মজুমদারের মতে- 'নেমেসিস বিশ্বসাহিত্যে এক চরিত্রের নাটক হিসেবে এতটাই সার্থক অভিনয় সৃষ্টি করেছে যে সত্যিই এই রচনাটি অতিশয় অভিনব কলাকৌশলের পূর্ণ সাফল্য ঘোষণা করিয়াছে। আমি লেখক সম্বন্ধে বড় আশা করি। তাঁর লেখনী জয়যুক্ত হোক।'

সংলাপের ব্যঞ্জনায়, ঘটনার অনিবার্যতায় ও সর্বোপরি উপস্থাপনায় 'নেমেসিস' একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। সমকালীন সমাজ ব্যবস্থা,আধুনিক জীবন চেতনা ও আঙ্গিকের নিরীক্ষায় বাংলাদেশের প্রথম বিশ্বাভিমুখী নাটক এটি। এ নাটক নুরুল মোমেনের তথা বাংলা নাটকের একটি সাহসী ও সার্থক সৃষ্টি।

কবর

লেখকের নাম	: মুনীর চৌধুরী
প্রথম প্রকাশ	: ১৯৫৩
সংস্করণ	: জানুয়ারি ২০১৩
প্রকাশক	: আহমদ পাবলিশিং হাউজ
পৃষ্ঠা	: ৬৪
মূল্য	: ৭০ টাকা

মুনীর চৌধুরীর (১৯২৫-১৯৭১) রক্তাক্ত প্রান্তর, চিঠি প্রভৃতি নাটক সবিশেষ সাফল্য লাভ করলেও জনমানুষের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও প্রশংসা পেয়েছে কবর নাটকটি। বিষয়-ভাবনা এবং পরিবেশন শৈলীর কারণেই সম্ভত এটির প্রচার ও প্রসার অসামান্য। কবর গভীর জীবনবোধের আলোকে সজ্জিত নাটকটি। এধরনের নাটক অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের সৃষ্টি। পৃথিবীখ্যাত নাট্যনির্মাতা ইবসেনের সামাজিক-বাস্তবতাবোধ, বার্নার্ড মশ-এর ব্যঙ্গাত্মক জীবন জিজ্ঞাসা, পিরান্দেলো-ব্রেখট-বেকেটের প্রগাঢ় শিল্পলগ্নতা আর মন্মথ রায়ের ভাষায় গভীরতা প্রভৃতি অগ্রসর ভাবনা-প্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুনীর চৌধুরী নির্মাণ করলেন বাংলা ভাষার আধুনিকতম নাটকের বারান্দা, যেখানে সহজ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে অনায়াসে দেখে নেওয়া যায়। জীবনের রূপ-নিবিড়তা ও গন্ধ গভীরতা। মুনীর চৌধুরী তার সমকালের সহজ অনুভবের শিল্পকারিগর।

কবর নাট্যকারের দৃষ্টি-উন্মোচনকারী সৃষ্টি। এর প্রেক্ষাপট পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন। বিষয় এবং পরিবেশন কৌশলের দিক থেকে নাটকটি গতানুগতিকতার বাইরে এক নবতর সংযোজন। জাতীয় চেতনার প্রতি প্রবল বিশ্বস্ততা আর মার্যাদা রক্ষায় প্রতিবাদ প্রকাশে এর ভূমিকা অপরিসীম। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে কেবল উর্দুকে ঘোষণা করার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব-পাকিস্তানে প্রতিবাদেও ঝড় সৃষ্টি হয়েছিল। তার সাহিত্যিক ভাষারূপ বর্তমান নাটক। ভাষা-আন্দোলনের স্বপক্ষে কাজ করার অপরাধে মুনীর চৌধুরীকে কারাবরণ করতে হয়।

১৯৫২-৫৪ সময়ে জেলখানায় থাকাকালে বামপন্থী বিপ্লবী রাজনীতিবিদ রণেশ দাশগুপ্তের অনুরোধে, ১৯৫৩ সালে প্রথম ভাষাদিবস পালন উপলক্ষে পরিবেশনের জন্য তিনি রচনা করেন করব নাটক এবং এটি যথাসময়ে কারাকক্ষেই মঞ্চস্থ হয়।

আপাতদৃষ্টিতে ফরমায়েসি সৃষ্টি মনে হলেও এর কাঠামোয় রয়েছে শিল্পী মুনীরের মনে গেঁথে থাকা অনুভবের প্রবল-প্রভাতি চিন্তার ছাপ। ভাষা-আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণে নিহতদের রাতারাতি কবর দেওয়ার জন্য, রাজনৈতিক হাঙ্গামা কৌশলে এড়ানোর জন্য শাসকগোষ্ঠী ছিন্নভিন্ন মৃতদেহগুলিকে পুঁতে ফেলতে চাইলে ইসলাম ধর্মের রীতিবিরোধী বলে গোর খুঁড়েরা আপত্তি তোলে আর বারুদের গন্ধ থাকায় এ লাশ কবর দেওয়া হবে না বলে মত দেয় মুর্দা ফকির। এমতাবস্থায় বিপাকে পড়ে দায়িত্বে থাকা পুলিশ অফিসার এবং নেতা। পুলিশ অফিসারের নির্মোহতা এবং অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত ভারসাম্যহীনতা ও ভীতির পরিবেশ নাটকের আবহ প্রবম্বিত হয়। লাশগুলি সমবেত প্রতিবাদ জানায়। আমরা কবরে যাব না। আমরা বাঁচবো। এই হলো কবর নাটকের মূল পরিসর। এই ক্যানভাসে নির্মিত হয় সংলাপ ও পরিবেশের কলা- কৌশল। কাহিনীতে প্রবেশ করে পূর্বাপর আবহের আলো-আধাঁর।

নাটকের আবহে লাশগুলি জীবিতের ভূমিকায় অবতীর্ণ। কথোপকথনে তাদের অংশগ্রহণ আর তাদের প্রতিবাদের বাস্তব অবস্থা পাঠককে প্রকৃত ঘটনার কাছাকাছি নিয়ে দাঁড় করায়। নেতা ও পুলিশ-ইন্সপেক্টর তাদের বুঝানোর চেষ্টা করে, ভয় দেখায়, আশ্বস্ত করতে চায়। কিন্তু তারা নাছোর বান্দা। কাহিনীতে ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতিনিধিদের আচরণ এবং ভাষা-ঐতিহ্য-মর্যাদা রক্ষাপ্রত্যয়ী জনতা প্রতিনিধির ভূমিকা চিত্রিত হয়েয়ে একটি সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বাস্তব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে। নামহীন নেতার নির্মমতা-বিশ্বাসঘাতকতা-মিথ্যাচরিতা আর ক্ষমতার প্রতি অপরিসীম লোভ- এ কথামালা সাজানো হয়েছে তৎকালীন রাজনীতির নোংরা রূপ তুলে আনার প্রয়াসে। নাট্যকার এ নাটকে মানবতাবাদী ভাবানার প্রকাশ দেখাতে চেয়েছেন। পরাক্রমশালী রাজনীতির দৌরাত্ম্য ও অসহায়তা এবং আদর্শবাদী চিন্তাধারার মাহত্ম্য রচিত হয়েছে নাটকটির সংলাপের চমৎকারিত্ব ও আভিজাত্যে। রাজনৈতিক প্রতাপ, অহমিকা, জণগনের নাম করে নিজেদের উদরপুর্তি আর ক্ষমতার অপপ্রয়োগ যে জাতিগতভাবে হীনমন্যতাকে লালন করে তার বাস্তব চিত্র মুনীর চৌধুরী নির্মাণ করেছেন।

রক্তাক্ত প্রান্তর

লেখকের নাম : মুনীর চৌধুরী
প্রথম প্রকাশ : ১৯৬২
সংস্করণ :
প্রকাশক :
পৃষ্ঠা :
মূল্য :

বাংলা নাট্যসাহিত্যে যাঁরা বিষয় ও প্রকরণ দুই দিকে আধুনিকতার প্রর্বতন করেছিলেন, মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) তাঁদের অগ্রগন্য। তিনি ইতিহাসের পটে নাটক লিখলেও বর্ণিত যুগের জীবন যাত্রা ফুটিয়ে তোলার কোন চেষ্টা তার মধ্যে ছিল না। বরং চরিত্রসমূহকে আধুনিক জীবনচেতনা দান করে তিনি আমাদের কালের দ্বন্দ্ব ও বিক্ষোভকে প্রকাশ করেছেন। মুনীর চৌধুরীর বিখ্যাত নাটক রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৬২)। এ নাটকের বিষয়বস্তু তিনি কয়কোবাদের মহাকাব্য মহাশ্মশান থেকে গ্রহণ করেছেন। কাহিনী কায়কোবাদ থেকে গ্রহণ করলেও পাত্রপাত্রীর হৃদয়দ্বন্দ্বের প্রাবাল্য, যুদ্ধবিরোধী চেতনা ও স্বদেশানুরাগের সংঘাত চিত্রণে নাট্যকারের যদি কোন ঋণ থেকে থাকে তা মধুসূদন ও বরীন্দ্রনাথের কাছে। কায়কোবাদ ১৭৬১ সালে সংঘটিত পানিপথের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহাকাব্যটি রচনা করেন। ১৭৬১ সালে ভারতের পানিপথে (বর্তমান ভারতের হরিয়ানা প্রদেশের অন্তর্গত প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্র) সংঘটিত যুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম উভয়পক্ষের শক্তিক্ষয়কেই মানবিক বিচারের দন্ডে তুলে ধরা হয়েছে।

রক্তাক্ত প্রান্তর নাটকের কাহিনীবিন্যাস এরকম- পানিপথের প্রান্তর। এক পাশে মুসলিম শিবির, অন্যপাশে মারাঠাদের কুঞ্জুরপুর দূর্গ। দু'পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হবে যে কোন সময়। দু'পক্ষেরই চলছে যুদ্ধের প্রস্তুতি-পরিকল্পনা। মুসলমানদের পক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কাবুলে অধিপতি আহমেদ শাহ আবদালী, রোহিলার নবাব নজীবুদ্দৌলা, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং মেহেদী বেগের কন্যা জোহরা বেগম। অন্যদিকে মারাঠদের পক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বালাজি রাও পেশোয়া, ত্রিশুল বাহিনীর রঘুনাথ রাও, সদাশিস রাও এবং ইব্রাহিম কার্দি। মুসলিম পক্ষের জোহরা বেগমের স্বামী হিন্দুদের পক্ষের সেনাপতি ইব্রাহিম কার্দি। জোহরা বেগম বারবার ছদ্মবেশ ধারণ করে মারাঠা শিবিরে প্রবেশ করে স্বামী ইব্রাহিম কার্দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু ইব্রাহিম কার্দি নিজ সিদ্ধান্তে অটল। আদর্শগত কারণেই জোহরা বেগমকে গভীরভাবে

ভালাবাসলেও ফিরে আসতে নারাজ। কারণ ইব্রাহিম কার্দিও যখন কোন কর্মসংস্থান ছিল না তখন হিন্দু মারাঠাই তাকে চাকরি দিয়েছে এবং পদোন্নতি দিয়ে সেনাপতি বানিয়েছে। অতএব মারাঠদের বিপদের দিনে তাদের ফেলে সে চলে আসতে পারে না। অন্যদিকে জোহরা বেগমও তার জায়গায় অনড়। হিন্দু-মুসলিম দুপক্ষই পরস্পরকে নিশ্চহ্ন করে দেওয়ার আক্রোশে ফেটে পড়ে। হঠাৎ করে অতর্কিত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অত্যন্ত ভয়ংকর ও বিধ্বংসী পরিণাম ঘটে। দু'পক্ষে হতাহত ও মৃত্যু ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতিহিংসা ও ক্ষমতা দখলের সমস্ত নৃশংসতাকে ছাড়িয়ে যায়। যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করে। মারাঠা বাহিনীর সেনাপতি ইব্রাহিম কার্দি ধৃত হয়। জোহরা বেগম ওই যুদ্ধের সর্বাধিপতি আহমদ শাহ আবদালীর কাছে স্বামী ইব্রাহিম কার্দির মুক্তি দাবি করে। সর্বসম্মতিক্রমে মুক্তির ফরমান নিয়ে জোহরা বেগম কারাগারে ইব্রাহিম কার্দিকে মুক্ত করতে গিয়ে দেখে ইব্রাহিম কার্দি মারা গেছে। ইব্রাহিম কার্দি ক্ষুদ্র মুক্তিকে অস্বীকার করে বৃহৎ মুক্তিকে গ্রহণ করে।

রক্তাক্ত প্রান্তর নাটকটির কাহিনীবন্যাসে একদিকে যেমন যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির মধ্যে দিয়ে যুদ্ধবিরোধী চেতনার বিকাশমুখী প্রবাহ প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি প্রধান নারী চরিত্র জোহরা বেগমের জীবনে নেমে এসেছে নিয়তিনির্ভর পরিহাসে বিয়োগান্ত পরিণতি। আদর্শগত দ্বন্দ্বের কারণে ইব্রাহিম কার্দি মারাঠাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। বিষয়বস্তু, ঘটনা ইতিহাসনির্ভর। কল্পনার প্রাধান্যে প্রত্যুজ্জ্বল। মানবীয় আবেগ প্রস্ফুটিত। সম্ভবত সেজন্যেই নাট্যকার মুনীর চৌধুরী নিজেকে ইতিহাসের দাস না বলে নাটকের বশ বলে উল্লেখ করেছেন।

নাট্যকার মুনীর চৌধুরী বলেন, যুদ্ধাবসানে পানিপথের প্রান্তরে অবশিষ্ট যে কয়টি মানব-মানবীর হৃদয়ে স্পন্দন অনুভব করি তাদের সকলে অবান্তর রণক্ষেত্রের চেয়ে ভয়াবহরূপে বিধ্বস্ত ও ক্ষতবিক্ষত। প্রান্তরের চেয়ে এই রক্তাক্ত অন্তরই বর্তমান নাটক রচনায় আমাকে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে।

সুবচন নির্বাসনে

লেখকের নাম : আবদুল্লাহ আল মামুন
প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৪
সংস্করণ : ২০১২
প্রকাশক : মুক্তধারা
পৃষ্ঠা : ৪৫
মূল্য : ৬০ টাকা

আবদুল্লাহ আল মামুন (১৯৪৩-২০০৮) বাংলাদেশের অগ্রগন্য নাট্যকার। এদেশের নাট্যজগতকে নানাভাবে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। নাটক নিয়েই কেটেছে তার জীবন। মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের মানুষের নৈতিক স্খলন, নারীর অবমাননা এবং সমাজের নান অধঃপতন নিয়ে নাটক লিখেছেন। সুবচন নির্বাসনে আব্দুল্লাহ আল মামুনের বহুল অভিনীত একটি নাটক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের সমাজে দেখা দেয় মূল্যবোধের অবক্ষয়। এই অবক্ষয়কে কেন্দ্র করেই নির্মিত হয়েছে নাটকটির কাহিনী। একটি পরিবারের জীবন প্রবাহ এই নাটকের কেন্দ্র। একটি পরিবারের কর্ত বাবা আদর্শের প্রতিভূ স্কুল-মাস্টার। বড় ছেলে খোকন। ছোট ছেলে তপন এবং মেয়ে রানু।

স্কুল মাস্টার সারাজীবন কষ্ট করেছেন। তিনি সৎ থাকার সংগ্রাম করেছেন। তিনি সন্তানদের শিখিয়েছেন সততাই মহৎ গুণ। কিন্তু তার সন্তানরা এ আদর্শকে ধারণ করে জীবন চলতে গিয়ে পদে পদে হোঁচট খায় এবং বুঝে বাবার শিখানো নীতিবাক্যগুলো ঘুনেধরা সমাজে অচল। খোকনের বিএ-র ফলাফল বেরিয়েছে সেকেন্ড ক্লাশ। একটু এদিক সেদিক করলে ফাস্ট ক্লাশ পেতো কিন্তু তা করে নি। রেজাল্টের পর স্কুল মাস্টার পিতা খোকনকে পার্ট টাইম চাকুরি করে লেখাপড়া করার কথা বলে। খোকন একটা বায়োডাটা নিয়ে পিতার বন্ধু বড় অফিসের বসের কাছে যায়। বস বলে ঠিক আছে দেখব। কিন্তু অফিসের কেরানী তাকে জানিয়ে দেয় তার চাকুরী হবে না। খোকনের চেয়ে খারাপ রেজাল্টধারী অন্য একজন যে থার্ড ক্লাশ পেয়ে পাশ করেছে তার চাকুরী হয়। খোকন তার প্রতিবাদ করলে বস তাকে পুলিশে দেয়। অর্থাৎ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। সে পিতাকে জানায় যদি আমার কানে সততার নামতা না পড়তে তা হলে আমি ঠিকই চাকুরি পেতাম। তপন স্কুল মাস্টারের ছোট ছেলে।

পিতার উদ্দেশ্যে বলে, বাবা আমাকে শিখিয়েছেন লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড় চড়ে সে। তপন জানায় উল্টো কথা, তার বড় ভাই লেখাপড়া করেছে কিন্তু গাড়ি ঘোড়া চড়া তো দূরে থাক সে জেল খেটেছে। সে তার ভাইয়ের জেলটাকে কোনভাবেই মেনে নিতে পারে না। তপন ওই বস ও কেরানরি কাছে যায় এবং বসের ব্রিফকেস খুলে সব টাকা নিয়ে আসে। পুলিশ তপনকেও খুঁজে। স্কুল মাস্টার পিতা জানায়- একটা আঘাতেই যাদের আদর্শ বিচ্যুত হয়, তাদের আদর্শের ভিত্তি দুর্বল।

রানুর বিয়ে হয় কেরানির সাথে। একদিন কেরানির বস তার বউকে দেখতে বাসায় আসে। রানু ভালভাবে তাকে খাওয়া দাওয়া করায়। একসময় বস রানুর সাথে কথাবার্তা বলে কেরানি অন্য খানে চলে যায়। এই সুযোগে বস রানুর হাত ধরে। কেরানি আসলে রানু বলে এ রকম জঘন্য চরিত্রের লোকের চাকরি করার কোনো দরকার নেই। কেরানি বলে তোমার না থাকতে পারে, আমার দরকার আছে। সে জানায় তার চাকরি হারানো চলবে না। সে চায় তার স্ত্রী বসকে মদ ঢেলে দিক। কিন্তু বাবার শিখানো সততার কারণে রানু তা পারে না ফলে স্বামীর সংসার তার আর করা হয় না।

স্কুল মাস্টার বাবা বেদনায় সিক্ত হয়। হৃদয় ভেঙ্গে খান খান হয় তার। সারা জীবন যে আদর্শেও লড়াই করে জীবন অতিবাহিত করেছেন তার সবটাই কি আজ মিথ্যা হয়ে গেল! সন্তানদের কারো নিশ্চিত জীবন তিনি দেখতে পেলেন না। একজন বাবা জীবন্ত লাশে পরিণত হলেন। বাবা আর্ত হাহাকারে ফেটে পড়ে, তার সততার দাম কেউ দেয়নি। সততাই অপরাধ। সততা গুণ নয়- সততাই নির্বুদ্ধিতা।

একজন স্কুল মাস্টার নিজের জন্য বিচারপ্রার্থী। কারণ সারাজীবন যে আদর্শে ছেলেমেয়েদের বড় করে তুলেছেন। সে আদর্শেও জন্য প্রতিটি ছেলে মেয়ে সমাজে অচল হয়ে গেছে। তারা কেউ বাঁচার জন্য সমাজে ঠাঁই পেল না। বাস্তবের সাথে আদর্শের এ অমিল দেখে হতবাক স্কুল মাস্টার। ঠিক যেন বইয়ের পাতার পড়া পড়ে জীবনে চলতে গিয়ে একে ব্যর্থ হয়ে গেল খোকন, তপন ও রানু। সময়ের বিচারে আব্দুল্লাহ আল মামুনের সুবচন নির্বাসনে এখনও প্রাসঙ্গিক। এখনো আমাদের সমাজে উচিত কথা, নীতি কথা অর্থাৎ সুবচনের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। এই সুবচনকে নির্বাসনে পাঠিয়ে সমাজের সুবিধাবাদীর ফায়দা লুটছে। সমাজে আজ তাদেরই জয়জয়াকার।

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

লেখকের নাম : সৈয়দ শামসুল হক
প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৬
সংস্করণ : ২০১১
প্রকাশক : চারুলিপি প্রকাশন
পৃষ্ঠা : ৮৫
মূল্য : ১২০

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হকের বহুমুখী সৃষ্টিশীল সাহিত্য প্রতিভার অন্যতম প্রধান ফসল তাঁর কাব্যনাট্য। বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতা সংগ্রামের আলেখ্য নিয়ে লেখা সৈয়দ শামসুল হকের (১৯৩৫-) প্রথম কাব্যনাটক পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়। এর ভূমিকায় সৈয়দ শামসুল হক লিখেন- 'সত্তরের দশকের মাঝামাঝি, বিদেশ থেকে ছুটিতে দেশে ফিরে ঢাকার প্রবল নাট্যতরঙ্গে ভেসে যাই এবং ফিরে গিয়ে রচনা করি 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' এ রচনাটি শেষ করে উঠবার পরে মনে হয়, দীর্ঘদিন থেকে এরই জন্যে তো আমি প্রস্তুত। মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের নিরীহ, সরল ও সবল মানুষ স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। আর এ যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকরা শুরু তার স্বজনকে হারায়নি, হারিয়েছে মানুষের বিশ্বাস এবং নিজের জীবন।'

নাটকের কাহিনী এরূপ- চারিদিকে যুদ্ধের উত্তেজনা। ১৭ গ্রামের নারী-পুরুষ এসেছে মাতবরের কাছে।তাদের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। মাতবর বলছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন তার সাথে দেখা করেছে। গ্রামবাসীকে মাতবর পাকিস্তানী বাহিনীর উপর ভরসা রাখার কথা বলে। কিন্তু গ্রামের সহজ-সরল মানুষ বিশ্বাস রাখতে পারছে না তার কথায়। কোথায় যেন রহস্য আছে বলে মনে হয় তাদের কাছে। এমতাবস্থায় হঠাৎ ঘর থেকে বের হয় মাতবরের মেয়ে। সকলের নিকট বাবার কুকর্মের কথা বলে দেয়। বলে দেয় বাবা হয়ে নিজের মেয়েকে তুলে দিয়েছিল ক্যাপ্টেনের হাতে। পরে সে বীরাঙ্গনা বিষপানে আত্মহত্যা করে। এভাবে নাটকের কাহিনী এগিয়ে যায়।

এ নাটকে নাট্যকারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল সমস্ত ঘটনাকে গ্রামবাসীর মধ্য দিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া। এ নাটকের নায়ক একক কোন ব্যক্তি নয় ৬৮ হাজার গ্রামবাসীর মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ।

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নাটককে অনেকে অতি সরলীকরণ করে শুধু মুক্তিযুদ্ধের নাটক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নাটকটি নিঃসন্দেহে রচিত এবং নাটকটির ঘটনা মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে প্রবাহিত। এই নাটকে জীবনের মৌল জিজ্ঞাসাগুলো প্রথিত হয়েছে অনন্য কুশলতায়। রূপালঙ্কার ও উপমা ব্যবহারেও যে সৈয়দ শামসুল হক সিদ্ধহস্ত তা নাটক পাঠেই বোঝা যায়। আঞ্চলিক ভাষার যথার্থ ব্যবহারে যে নাট্যকার পারঙ্গম, তা পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, নাটকের শরীরজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

কথাসাহিত্যিক শামসুল হকের আর এক পরিচয় তিনি একজন কবি। তাই কাব্যনাট্য রচনা তাঁর অনায়াসলব্ধ। তিনি কাব্যনাট্য রচনাকে শুধু সাহিত্য চর্চার মাধ্যম হিসেবে দেখেননি একে গণআন্দোলনের হাতিয়ার করতে চেয়েছেন। এই ইচ্ছা নিয়ে রচনা করেছেন তাঁর সাড়া জাগানো কাব্যনাটকগুলো।

ওরা কদম আলী

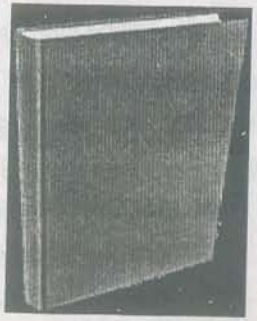

লেখকের নাম : মামুনুর রশীদ
প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৮
সংস্করণ : ২০০৮
প্রকাশক : মুক্তধারা
পৃষ্ঠা : ১০০
মূল্য : ৮০ টাকা

বঞ্চিত শোষিত মানুষের শ্রেণি সংগ্রামের রূপকার হিসেবে মামুনুর রশীদ (১৯৪৮-) বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ধারায় যুক্ত করেছেন বিশিষ্ট মাত্রা। এসব নিপীড়িত মানুষের জন্য নাটক লিখতে গিয়ে তিনি নাটকে নিয়ে এসেছেন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ চেতনা। ১৯৭৮ সালে ওরা কদম আলী প্রকাশের মধ্য দিয়ে মামুনুর রশীদের আর্বিভাব ঘটে নাট্যকার হিসেবে। গরিব ও মেহনতি মানুষের ব্যক্তিক প্রতিবাদ কীভাবে সামষ্টিক রূপ পরিগ্রহ করে কদম আলী নাটকের একটি বোবা চরিত্রের মধ্য দিয়ে এ নাটকে তা দেখানো হয়েছে। কদম আলীদের ওরা ভাবা হয়েছে। আমরা ভাবতে পারেননি লেখক।

অনুন্নত বিশ্বে দারিদ্র পীড়িত দেশের অধিকাংশ মানুষ শুধু তার জীবনটাকে বাঁচাবার তাগিদেই এক মানবেতর জীবন যাপন করে। প্রতি মুহূর্তে নিজের জীবনটাকে ধিক্কার দেয়। কিন্তু মৃত্যুর মুহূর্তে সে বাঁচবার জন্য আকুল চেষ্টা করে। হয়তবা এই আশায় যে পরবর্তী মুহূর্তটিকে সে জীবনের পরিপূর্ণ আস্বাদ পাবে। শুধু জীবনের তাগিদেই বেঁচে থাকা অধিকাংশ মানুষ যে এই অবস্থা মেনে নিচ্ছে না। তারাও যে জীবন দিতে চায় মহান আদর্শের জন্য এবং যা সম্ভব শুধুমাত্র তাদের ঐক্যের মাধ্যমেই। সেই সম্ভাবনাকে প্রতিফলিত করার একটা ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হচ্ছে ওরা কদম আলী।

ওরা কদম আলী নাটকে শ্রেণি বিভক্ত সমাজের একটি অতি সাধারণ চিত্র তুলে ধরতে বোবা কদম আলী, নায়েব আলী ব্যাপারী, তাজু সর্দার রূপয়, চা-ওয়ালা, বইওয়ালা এর যতগুলো সামাজিক সম্পর্ক, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অবস্থা তাদের সমাজে। বোবা কদম আলীর লড়াই আপত দৃষ্টিতে শিশু তাজুকে নিয়ে হলেও তা আসলে এই সমাজের একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত চেহারা। যে যুদ্ধ ক্রমাগত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

কিত্তনখোলা

লেখকের নাম	: সেলিম আল দীন
প্রথম প্রকাশ	: ১৯৮৩
সংস্করণ	: অক্টোবর ২০১৪
প্রকাশক	: মাওলা ব্রাদার্স
পৃষ্ঠা	: ১২০
মূল্য	: ১৬০ টাকা

আবহমান বাংলা ভাষার ঐতিহ্যসঞ্চারী নাট্যকারগনের এক মুকুটহীন রাজা সেলিম আল দীন (১৯৪৮-২০০৮)। তিনি ছিলেন হাজার বছরের বাঙালী নাট্যসংস্কৃতির এক অনুসন্ধানী দ্রষ্টা। তার অনবদ্য নাটক কিত্তনখোলা। স্থানীয় মেলাকে কেন্দ্র করে এ নাটকের কাহিনী ভাষ্য রচনা করেছেন। নাটকের কাহিনীতে মেলায় আসা যাত্রাদলের অভ্যন্তরীন প্রেম, ভালবাসা, বিরহ যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি এ নাটকে আছে মানুষের বিভিন্ন পর্যায়ে রূপান্তরের

গল্প। নাটকে কোন একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়কে নয় একটি মেলাকে কেন্দ্র করে সমগ্র বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে বিষয় সুনির্দিষ্ট না হলেও এর শিল্পরস এবং সত্য ও বাস্তবতাকে দর্শক ঠিকই অনুধাবনযোগ্য। কারণ নাটকে ভিন্ন আঙ্গিকে সমাজের অনুপম শাশ্বত সত্য আমাদের ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব নাট্য ছন্দ রচিত হয় নাট্য মঞ্চে। নাটকে ব্যবহৃত সংলপাগুলো মনে হয় একেকটি জীবন দর্শন। বিশেষ করে নাটকের চরিত্র ছায়া, সোনাই কিংবা বনশ্রীর কষ্ট যন্ত্রনা দর্শকরা অনুভব করেন আপন সত্তায়। তেমনি ইদু কন্ট্রাকটারের মতো মানুষের জন্য দর্শকের মধ্যে এক ধরণের ক্ষোভ জেগে উঠে।

কীত্তনখোলা নাটকেও লক্ষ্য করা যায় নারী নির্যাতনের এক ভিন্নধর্মী চিত্র। গ্রামীণ যাত্রাদলের কর্তা সুবল ঘোষ ইচ্ছে পোষণ করে যে তার দলের মেয়েরা এলাকার মাতব্বরদের রাত্রিকালীন বিনোদনে স্বেচ্ছায় অংশ নিক। তার এই আপোসকামিতায় মেয়েরা প্রতিবাদী হয়। এভাবেই নাটকে একদিকে কিত্তনখোলার জনমানুষের জীবন, শিল্প, যৌনতা ও নৈতিকতাকে প্রকাশ করেন।

নাট্যকার এ নাটকে নারীর আর্কিটাইপিক্যাল বৈশিষ্ট্য তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। ডালিমন ও বনশ্রীবালা যেন চিরকালের বাঙালী নারীর শাশ্বত রূপ। সৎ, সামাজিক ও শৈল্পিক। একজন হিংস্র ও বৈরী। অন্যজন আত্মসমর্পিতা। একজন সম্প্রদায়কে ভালবেসে নিজেকে আত্মহত্যার মাধ্যমে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। আরেকজন সম্প্রদায়কে ভালবেসে তাদের সুরক্ষার জন্য আপোস করে। নিজের নারীসত্তাকে বিসর্জন দেয়। এ নাটকে চরিত্র অগনন। যেন শত শত মানুষ এক মহাকাব্যের পাদপীঠে এসে মিলিত হয়েছে।

নাটকের পটভূমি একটি মেলাকে কেন্দ্র করে। এই মেলা যেন গোটা বাংলাদেশকে অন্তভূক্ত করে। মেলায় মিলিত মানুষের সমাবেশ উন্মোচিত করে আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ মানুষের মধ্যকার নর ও নারীরসহ অবস্থানের ভেদজ্ঞান।

এ নাটকে সংলাপের বদলে বর্ণনার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছিল। সংলাপগুলো ছিল ন্যারেটিভ। নাট্যরীতি ছিল বর্ণনাধর্মী ও গীতিধর্মী। গান ও নাচের এক বিপুল আসর যেন দানা বেধেঁ ওঠে। পালাগান, জারিগান ও সারিগানের এক লিরিক্যাল চেতনাপ্রবাহ, যা বাঙালি সংস্কৃতির মূল ধারায় সন্নিবেশিত ছিল তা বাঙময় হয়ে উঠে।

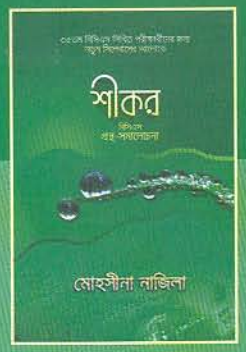

মেঘ প্রকাশনা
বাড়ি-৪৯, রোড-১০, দক্ষিণ বিশাইল,
চাইনিজ বাসষ্ট্যান্ড, মিরপুর-১, ঢাকা

design centre : 01732966753, 01767838935

৩৫তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার্থীদের জন্য
নতুন সিলেবাসের আলোকে

শীকর

বিসিএস
গ্রন্থ-সমালোচনা

মোহসীনা নাজিলা